তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ

বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। উনিশ শতকের যুগবিপর্যয়ের কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যেমন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল—যে কারণে তিনি অনেক ভক্তের কাছে যুগদেবতা, তেমনি আবার তাঁর ভাব ও জীবন অনেকের আদর্শ হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে তিনি দেবত্বের আবরণ ছেড়ে মানবের আড়ালে মহামানব হয়ে নানারূপে উঠে আসেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব জনমানসে মননপ্রসূত হয়ে বিভিন্ন মাত্রায় ধরা দেয়। তাই তিনি কখনো যুগদেবতা, কখনো অবতারবরিষ্ঠ, কখনো মুক্তপুরুষ, কখনো পরমপুরুষ, কখনো মহামানব, কখনো বা পরমহংস গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের কয়েক বছরের মধ্যেই সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর পদার্পণ ঘটে। তবে কথাসাহিত্যের জগতে তিনি এসেছেন সম্ভবত হারাণ চন্দ্র রক্ষিতের হাত ধরে। এই কথাসাহিত্যে আবির্ভাব তাঁর জনপ্রিয়তাকে ইঙ্গিত করে। কারণ কথাসাহিত্যে আসার আগেই জীবনী সাহিত্যে তাঁর সচল ও সক্রিয় গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। বেশ কিছু জীবনী গ্রন্থ রচিত হলেও তা উপন্যাসের অঙ্গনে এসে পৌঁছাতে পারেনি। এর প্রধান কারণ অবশ্যই লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার বিষয়টিতে নিহিত। তারা শ্রীরামকৃষ্ণকে চেয়েছিলেন মহাপুরুষ তথা দেবপুরুষরূপে। ফলে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সকল বাদ দিয়ে জীবনী গ্রন্থের মতো অবলীলায় জীবন চিত্র লিখে গেছেন। সাধু-সন্তদের জীবনীর সঙ্গে সেকারণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীর কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। অন্যদিকে উপন্যাস রক্তমাংসের সজীবতায় পূর্ণ থাকে। সেখানে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলা হয়। চরিত্র হয় প্রাণময়, জীবন্ত মানব। কিন্তু জীবনীতে কথার মতো করে বলার যেমন কোনো বিষয় থাকে না, তেমনি চরিত্রের অলৌকিক আবহ রচনাতেও কোনোরূপ দ্বন্দ্ব দেখা যায় না। ফলে একদিকে মহাপুরুষের জীবনী লেখা যতটা সহজ, তেমনি তাকে উপন্যাসের আদলে ফেলে চরিত্রকে জীবন্ত ও

বাস্তবোচিত করাটাও বেশ দুরূহ। আবার জীবনী গ্রন্থগুলি যখন উপন্যাসের আকর গ্রন্থ হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে, তখন একাধারে যেমন উপন্যাসগুলি জীবনীর আধার হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে উপন্যাসের সার্থক বৈশিষ্ট্যগুলি পালন করলে তখন জীবনীর যথার্থতাকে অস্বীকার করে জীবনীর আধার হয়ে ওঠে।

তবে জীবনী ও উপন্যাসের বিতর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রভাবই বিস্তার করুক না কেন, একথা না মেনে উপায় নেই যে বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব অতি প্রবল। বিশেষত উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবেদন অনেক বেশি সতেজ, প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। তাই উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ উপন্যাসের আধারে সফল রূপায়ণের মাধ্যমে জীবনীধর্মী উপন্যাসের নবদিগন্ত সূচিত হয়।

যেহেতু কথাসাহিত্যে রক্তমাংসের মানুষকেই সবচেয়ে বেশি আলোকিত করে, তাই সেক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ও বাণী প্রভাবিত উপন্যাসগুলি আলাদা মাত্রা পায়। কারণ সেখানে যুগপুরুষের তুলনায় মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা গুরুত্বসহকারে চিত্রিত হয়। বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব তাই দুইভাবে আলোচনা করা যেতে পারে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে। প্রথমটির ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাশ্রয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে। অন্যটি উপন্যাসে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও ভাবাদর্শ নানাভাবে, নানা প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গক্রমে উঠে এসেছে। সেদিক থেকে বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও আদর্শ নানাভাবে ব্যঞ্জিত, নানা রঙে রঞ্জিত। সেই ব্যঞ্জনা ও রঞ্জনার পরিচয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিতি শুধু আবেদনক্ষম হয়ে ওঠেনি, কথাসাহিত্যের ধারণাটিকেও সমৃদ্ধ করেছে তা উপন্যাস-গল্পেই প্রতীয়মান মনে হয়। এবার সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াই বিধেয়।

প্রত্যক্ষ প্রভাব

(১)

উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে তাঁর জীবন আশ্রয়ে যেসব উপন্যাস লেখা হয়েছে তাতে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি আমরা খুঁজে পাই। তাতে তাঁর জীবনই হল উপন্যাসের বিষয়-আশয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রথম উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হন হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬)। তাঁর সম্পর্কে সেরকম পরিচয় পাওয়া না গেলেও যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে তিনি চব্বিশ পরগনার মজিলপুরের বাসিন্দা। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে ঠিকানায় লেখা আছে—'কর্ণধার কুটীর', মজিলপুর, ২৪ পরগণা। 'কর্ণধার' এবং 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তিনি 'রায় সাহেব' উপাধি পান। হারাণচন্দ্র বেশকিছু উপন্যাস, গল্প, জীবনীগ্রন্থ ও নিবন্ধের রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য—'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম', 'ভবানী' 'ফুল', 'ফুলের বাগান', 'হেম-হার', 'মোহন-মালা', 'প্রতিভাসুন্দরী', 'প্রেম ও শান্তি', 'বঙ্গের শেষ বীর প্রতাপাদিত্য', 'মন্ত্রের সাধন বা রাণা প্রতাপ', 'জ্যোতির্ম্ময়ী বা নূরজাহান্', 'দুলালী', 'চিত্রা ও গৌরী', 'পারিজাত-মালা', 'সাহিত্য-সাধনা', 'রামকৃষ্ণ-শান্তিশতক', 'বঙ্গানুবাদ সেক্সপিয়ার', 'ভিক্টোরিয়া-যুগে বাঙ্গালা-সাহিত্য' ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর দুটি উপন্যাস পাওয়া যায়—'কামিনী ও কাঞ্চন' (২য় সংস্করণ-১৩১৫ বঙ্গাব্দ) ও 'ভক্তের ভগবান্' (দ্বিতীয় সংস্করণ-১৩৩২ বঙ্গাব্দ)। দুটি উপন্যাসেই শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন অন্য নাম নিয়ে। কিন্তু প্রথম কয়েকপাতা পড়লেই বোঝা যায় মূল চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া কেউ নন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হারাণচন্দ্রের 'কামিনী ও কাঞ্চন' প্রথম কবে প্রকাশিত হয়, তা না পাওয়া গেলেও গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের সময়কাল পাওয়া যায় শ্রাবণ, ১৩১৫

অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ ঠাকুরের তিরোধানের মাত্র বাইশ বছরের মধ্যে তাঁর জীবন ও বাণী (মূলত বাণী) নিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রায় সতের বছর পর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় পরিবর্ধিতরূপে। এটি উৎসর্গ করেন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। মূল্য দুই টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের শিরোনাম পত্রে লেখা ছিল একটি ইংরেজি ভাষায় প্রবাদবাক্য : "Truth is stranger than Fiction."[১] চতুর্থ'তে তা পরিবর্তন করে লেখেন : "ঈশ্বরই মানবজন্মের উদ্দেশ্য। সত্যকথা কলির তপস্যা। সত্যে আঁট থাক্‌লে ভগবান্ লাভ হয়। শেষজন্মে মানুষ সরল হয় ও একটু খ্যাপাটে ভাব থাকে। ভক্তিই একমাত্র সার ও জীবের শেষ সম্বল।"[২] বস্তুত এই উদ্ধৃতিটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' থেকে নেওয়া।

গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখক জানান :

> "ধ্যানে যে পরমপুরুষের অলৌকিক চরিত্র, অমূল্য উপদেশ হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়াছে,—তাহার দুই একটি ভাব, দুই চারিটি কাহিনী, আর এক ঈশ্বরজনিত মহাত্মার অদ্ভুত চরিত্রের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।"[৩]

সেই আদিগুরুর বিলাপান্তে লেখক জানিয়েছেন : "আজি দ্বাদশ বৎসরেরও অধিক,—সেই পুণ্যমূর্ত্তি,—সেই অপূর্ব্ব হাস্য-করুণা-মাখা মুখমণ্ডল দেখি নাই,"।[৪] ইনি যে শ্রীরামকৃষ্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ এই ভূমিকা লেখার বারো বছর আগেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ ঘটে। তবে বিতর্ক বাঁধে পরের বক্তব্যে : "—'কামিনী-কাঞ্চন'-বিজয়ী, যোগীশ্বর, ভক্তবৎসল পরমহংসদেবের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের সৌভাগ্য আমার হয় নাই।"[৫] এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু লেখকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ আদৌ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় অমরেন্দ্র দত্তের ষ্টার থিয়েটারে বর্তমান উপন্যাসটির নাট্যরূপ অভিনয় করার বিষয়টি সংযুক্ত হয়েছে।

সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম—'কামিনী—জননী'। এতে ১৪ টি পরিচ্ছেদ আছে। দ্বিতীয় খণ্ড—'কাঞ্চন—বন্ধন', এতে আছে ১৬ টি পরিচ্ছেদ। তৃতীয় খণ্ডের নাম—'কর্ম্মফল—তুষানল', এর সাতটি পরিচ্ছেদ।

প্রথম খণ্ডের নামেই ব্যঞ্জিত হয়েছে খণ্ডের বিষয়বস্তু। মানবজীবনে কামিনী কতখানি মায়াময়িত হয়ে জীবনকে যন্ত্রণার সাগরে নিমজ্জিত করতে পারে সেই নিয়ে এর বিষয়। প্রথম পরিচ্ছেদেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসেছেন ঠাকুর রামপ্রসাদ নামে :

> "নগরপ্রান্তে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ অবস্থিতি করেন। তাঁহার বহু শিষ্য-শাখা। বহু লোক তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তাঁহার নাম রামপ্রসাদ। ভক্তগণ তাঁহাকে ঠাকুর নামেও অভিহিত করেন।"[৬]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যা যা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তা সবই রামপ্রসাদ নামক ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত। নাম পরিবর্তন করলেও পাঠকের বিন্দুমাত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়রাম সবসময়ের জন্য মামার সঙ্গে থাকত। ঠাকুর তাঁকে হৃদু বলে ডাকতেন। এখানেও একজন শিষ্য সবসময়ের জন্য ঠাকুর রামপ্রসাদের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়, যাঁকে তিনি সিধে বলে ডাকেন। তার ভালো নাম সিদ্ধেশ্বর। বলাবাহুল্য, হৃদে-র সঙ্গে সিধের নামকরণেও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে আছে ঠাকুরের বারেবারে সমাধিস্থ হয়ে যাওয়ার বিষয়, গান করা, মুখে যা আসে তা-ই বলা, মা-মা করে ডাকা ইত্যাদি গুণাবলির পরিচয়। বেশ কিছু ঘটনার কথাও আছে যা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে জড়িত, যেমন দিগম্বর বেশে গঙ্গার বান দেখতে যাওয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদে উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র বন্ধুদ্বয় অতুলকৃষ্ণ ও প্রতুলকৃষ্ণ ঠাকুর রামপ্রসাদের কাছে আসে। এই দুটি চরিত্র নিয়েই ঔপন্যাসিক ঠাকুরের মূল বাণী কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের বিষয়টি দেখিয়েছেন। প্রথমজন কামিনীতে আসক্ত, তার গল্প প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয়জন কাঞ্চনে আসক্ত, তার গল্প দ্বিতীয় খণ্ডে এবং শেষ খণ্ডে এই দুই বিষয়ে আসক্ত পাপীদের শাস্তির বিধান ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব প্রচার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় সুন্দরীর প্রেমে মজেছে অতুলকৃষ্ণ। সুন্দরীর প্রেমাভিনয়ে অতুল পাগল। আপন স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে অতুল সেই রমণীর পানেই ধাবিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য খুব সুন্দর :

> "সুন্দরী কি কুৎসিত জানি না,—তবে সৌন্দর্যের মধ্যেই অধিক বিষ থাকে।—সাপও সুন্দর, হীরাও সুন্দর,—উভয়ই কিন্তু বিষের আকর।"[৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে অতুলের সংসারের কথা ও তার স্ত্রী ও নাবালক পুত্র সুকুমারের কথা আছে। অতুল বুঝতে পারে সুন্দরীর প্রতি তাঁর পরকীয়া প্রেম গর্হিত কাজ, কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনা। চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে অতুল-সুন্দরীর পরকীয়া প্রেমের উৎস ও প্রকাশ বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, সুন্দরীর স্বামী নিরুদ্দেশ বলে সুন্দরীর এহেন কাজ। অতুল কলকাতায় এসে সাধক ঠাকুর রামপ্রসাদের সাহচর্য পান ও সুন্দরীকে ভোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন পর আবার সুন্দরীর প্রতি মোহ জন্মে। অষ্টম পরিচ্ছেদে অতুলকে দেখি আত্মসংগ্রামে রত থাকতে। 'কাঙ্গালের ঠাকুর' অতুলকে শক্তি জোগায়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও অতুল সুন্দরীর মোহ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনা। নবম পরিচ্ছেদে গায়কের গান ভীষণভাবে ইঙ্গিতবাহী :

"বুঝি, জনম বিফলে যায়।

হ'লো না, হ'লো না,

মায়ের সাধনা,

মা বুঝি গো ফাঁকি দেয়।।"[৮]

এই অধ্যায়ে অতুলের আন্তঃসংগ্রাম গভীরভাবে প্রকট হয়েছে। দশম পরিচ্ছেদে উনিশ শতকীয় মহিলা মজলিশকে মনে করিয়ে দেয়। তারা সুন্দরী ও অতুলের পরকীয়া প্রেমের চর্চা করে। মুখে মুখে টপ্পা, পাঁচালী ফেরে। পূর্বের 'জনম বিফলে যায়' গানটির গায়ক ভৈরবরূপিনী সন্ন্যাসীর কথা আসে। একাদশ পরিচ্ছেদে অতুল-সুন্দরীকে পরকীয়া প্রেমের মোহ থেকে বাঁচাতে মহিলা মহলের কামিনী ও সুরধনী নামের দুই মহিলা উদ্যোগ নেয়। লেখক জানিয়েছেন :

> "যখন অধর্ম্ম-আগুনের ফিন্‌কি দুই আধারে গিয়ে পড়েছে, তখন ঐ ফিন্‌কি যদি না নিবানো যায়, ত, ও ধিকি ধিকি করে দুজনকেই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে।"[৯]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তিনকড়ি অতুলকৃষ্ণকে এবং ঠানদিদি সুন্দরীকে তাদের কলঙ্ক সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে অতুলের পুত্র সুকুমারের বিসূচিকা রোগ হয়। মৃতপ্রায় পুত্র সন্ন্যাসীর অভয়দানে বেঁচে ওঠে। সন্ন্যাসী অতুলকে জানান যে, সব নারী সেই জগদম্বার অংশসম্ভূতা। তাই মায়ের অবমাননা করা উচিত নয়। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে পুত্র সুকুমার বেঁচে ওঠে। অতুলের স্ত্রী অমিয়াদেবী বলেন : "সুন্দরীকে মাতৃসম্বোধন কর। মা'র চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান কর।—নহিলে এ

মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত হবে না।"[১০] অমিয়ার বক্তব্যে যেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরই বাণী। তিনিই নারীজাতিকে মাতৃসম্মানে শ্রদ্ধা করতে বলেন। এপ্রসঙ্গে অমিয়া ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় অতুলকৃষ্ণকে। এখানেই প্রথম খণ্ড শেষ। বস্তুত ঠাকুরের পথ ধরেই কামিনীর প্রতি মোহ ত্যাগ করার উপায় জানিয়েছেন লেখক। কথামৃতের প্রতি পাতায় এই বাণী সহজলভ্য। কামিনীর মায়াজাল থেকে আপনার মুক্তি সম্ভব কেবল তাকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও দেখা যায় তন্ত্রসাধনার কালে মাতৃপূজা বা ষোড়শী উপচারে স্ত্রী সারদাদেবীকে শক্তিদেবীরূপে পূজা করা। লেখক হারাণচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলে যাওয়া উপায়কে সফলভাবে অনুসরণ করে উপন্যাসের একটি খণ্ড সমাপ্ত করেছেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'কাঞ্চন—বন্ধন'। এটিও শুরু হয়েছে ঠাকুর রামপ্রসাদের বাণী 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' দিয়ে। পাঠকমাত্রেই এটি জ্ঞাত থাকবে যে এই উক্তি ও আবিষ্কার দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ছাড়া আর কারো নয়। এই খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে :

> "গঙ্গার গর্ভে বসিয়া, ঠাকুর রামপ্রসাদ নির্ব্বিকার নিবিষ্টচিত্তে, সস্মিত বদনে এই কথা বলিতে বলিতে এল নূতন খেলা খেলিতেছেন।"[১১]

রামপ্রসাদের মুখেও বারংবার 'শালা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করতেন। গঙ্গা তীরেই সাধক রামপ্রসাদ বহুমূল্যবান তাগা ছুঁড়ে দেন। এই পরিচ্ছেদেই আছে এক বৃদ্ধের কথায় ঠাকুরের বাণী প্রকাশ—'সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান' বা শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রতুলকৃষ্ণের কাহিনি শুরু হয়েছে। সদ্য কলেজ থেকে পাশ করা প্রতুলের মনে হয়েছে টাকাই সব। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভাগ্যক্রমে প্রতুল বৃদ্ধ মাধবচন্দ্র বসুর জহরতের ব্যবসায় নামে। বন্ধু ভবদেব রায় দায়িত্ব পান মাধবের পৌত্রের গৃহশিক্ষক পদের। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভবদেব এই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে এবং প্রতুলের কূটবুদ্ধি ধরে ফেলে। বন্ধুকে তাই সে বলে : "সম্পদ্ ও বিভূতি হস্তগত হইবার অগ্রে, মনকে পবিত্র ও সংযত করিতে হয়। নচেৎ সে শক্তির অপব্যবহার হইয়া থাকে।"[১২] প্রতুলের মুখ দিয়ে বের হয় বর্তমান সমাজের বেশিরভাগ মানুষের মনের কথা ও আচরণের উপায়। সে জানায়, প্রতারণা, কপটতা ও ভাণ,—এগুলিই উন্নতির সোপান। এইকারণে

দেখা যায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রতুল সৎ হওয়ার ভান করে মাধবচন্দ্রের কাছে। মাছ-মাংস ছেড়ে নিরামিষ ভোজী হয়। জ্ঞানের কথা বলে। ভক্তিভাব প্রকাশ করে। লেখক জানিয়েছেন :

> "শঠতা ও প্রতারণা স্বভাবতই বড় ভয়ানক জিনিস। তাহা যদি আবার শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণে অভিনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রভাব তখন আরও ভয়ানক হইয়া থাকে। প্রতুলরূপী এই 'সভ' ও 'শিক্ষিত' জীবটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"[১৩]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রতুলের আসল রূপ ধরা পড়ে স্ত্রী রঙ্গমতীর সঙ্গে বাগানবাড়িতে খাওয়া ও কথোপকথনের মাধ্যমে। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রতুল স্ত্রী রঙ্গমতী ও ডাক্তার বন্ধু নীলকৃষ্ণ রায়কে অপেরা হাউস নিয়ে যায় হ্যামলেট নাটক দেখাতে। এই ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্য ডাক্তারকে রঙ্গমতী দিয়ে প্রলুব্ধ করা ও বশে আনা। অষ্ঠম পরিচ্ছেদে অর্থলোভী নীলকৃষ্ণকে হাতে আনতে সক্ষম হয় প্রতুল। নবম পরিচ্ছেদে কপট স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ফুটে ওঠে ডাক্তারকে ব্যবহার করে বৃদ্ধ মাধব ও তার পৌত্রকে স্লো পয়জনিং করা এবং পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে দশম পরিচ্ছেদে নীলকৃষ্ণকে অর্থলোভ, কামিনীলোভ ও প্রচুর খাবারের আয়োজন করে। এই কাজ করার জন্য তাঁকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে বলে প্রতুল জানায়। অন্যদিকে রঙ্গমতী তাঁর কাছে ঘেঁষে থাকে, মায়ায় জড়িয়ে ফেলে। একাদশ পরিচ্ছেদে প্রতুল নীলকৃষ্ণকে মাধবচন্দ্রের কাছে নিয়ে আসে তার গৃহডাক্তার করে। ডাক্তারও একটু একটু করে বিষ মেশায় দাদু-নাতির ওষুধে। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ফুটে উঠেছে লেখকের কথায় :

> "কিন্তু হায়, মোহাচ্ছন্ন বৃদ্ধ! জীবনের বৈতরণী তীরে দাঁড়াইয়া তোমার এত মায়া কেন? কে এ পৌত্র? কার জন্য এমন আঁকু-পাঁকু করিয়া মরিতেছ? কার জন্য এ যখের ধন মুনিয়া বসিয়া আছ?"[১৪]

কথামৃত-তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারের এই মায়াকেই ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে বলেছেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ঠাকুরের প্রসঙ্গ আছে। সর্বভূতে ঈশ্বরের কথা এসেছে। বলেছেন মন সাফ করে রাখতে আর সাধন-ভজনে মন দিতে। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ডাক্তার নীলকৃষ্ণ বিষ প্রয়োগে সক্ষম হয়। ১৪তম পরিচ্ছেদে 'মোহাচ্ছন্ন মাধবচন্দ্রের মোহ অবসানের শেষদিন।' মাধবচন্দ্রের পৌত্র তথা গিরিশের পুত্র সুশীলের বিষপ্রয়োগে মৃত্যুমুখে পতন। ডাক্তারের শুভবুদ্ধির জাগরণে অ্যান্টিডোট প্রদান সুশীলকে। ফিরিঙ্গি ডাক্তারের ছদ্মবেশে রঙ্গমতীর আগমন ও সুশীলের উদরাময় রোগে মৃত্যু বলে ঘোষণা। ১৫তম পরিচ্ছেদে শ্মশানের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ষোড়শ পরিচ্ছেদের স্থান নিমতলার ঘাট। সেখানেই চিতার পাশে

ঠাকুর রামপ্রসাদ বসে আছেন ভক্তমণ্ডলীর মাঝে। এখানেই বিরোধীদের বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে : "ও সেই রেমো পাগলার বুজরুকি!" কিংবা "ওঃ! সেই 'পরমহাঁস'—তাই বলো!"[১৫] এই ঘাটেই সুশীলের মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ মাধব ও প্রতুলসহ ডাক্তার এলে ঠাকুর অলৌকিকভাবে সব ষড়যন্ত্রের কথা ব্যঞ্জনায় বলে ফেলেন। মাধবকে সব বলে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন যাতে সে প্রতুলের ওপর প্রতিহিংসা না নেয়। এখানেই সাহেব ডাক্তারবেশী রঙ্গমতীর ছদ্মবেশ উদ্ঘাটিত হয়। সুশীল বেঁচে ওঠে। অধ্যায়ের শেষে মাধব ঠাকুরের নামকীর্তনে রত হয় :

> "চল, যাই তরী বেয়ে।
>
> কল্পতরু, কাঙ্গাল-গুরু, প্রসাদের নাম নিয়ে।।
>
> যেই কৃষ্ণ, সেই রাম,
>
> সেই আমার প্রসাদ, ..."[১৬]

গানটিতে আরো স্পষ্ট তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

তৃতীয় খণ্ডের নাম 'কর্ম্মফল—তুষানল'। এতে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির কর্মফল নির্ধারিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে অতুলের সঙ্গে সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়, যিনি একদিকে সুন্দরীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামী শিবনাথ দেব, অন্যদিকে ঠাকুরের শিষ্য। শিবনাথের সংলাপে যেন ঠাকুরের বাণীরই প্রতিফলন দেখা যায় : "যতদূর পারি, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘুরিয়া, বাক্যে কথনে, কার্য্যে, ব্যবহারে—জীবের কল্যাণসাধন করিব।"[১৭] দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঠাকুর রামপ্রসাদ অতুলকে কামিনীর মোহ থেকে বেরোনোর উপায় বলেছেন চুপি চুপি :

> "সুন্দরীকে মুখে মা বোলেছিস্, মনে মনেও সত্যি সত্যি মা বলিস্। বুঝ্লি? তোর নিজের মা'র মুখ তো মনে আছে? সেই মা'র মুখ মনে কোরে মা বলিস, —তা হোলে আর কোন আপদ-বালাই জুটবে না।"[১৮]

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে দেখা যায়, তিনি নাকি ভক্তের রোগ ও পাপ নিজের ঘাড়ে নিতেন। এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। রামপ্রসাদের সংলাপে পাওয়া যায় : "বড় আশা কোরে মা তোমার ঠাঁই এয়েছে,—মুখ রেখো মা! ওর পাপ না হয় আমায় দিও,—দোহাই মা আনন্দময়ী!"[১৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রতুল দুই বেশ্যা দিয়ে ঠাকুর রামপ্রসাদের সাধনাভঙ্গ করতে চাইলে তাতে ব্যর্থ হয় ও ধরা পড়ে যায়। ঠাকুরের সন্তান হয়ে মাতৃপূজার বিষয়টি ধরা পড়ে। তাঁর কথায় :

> "বেশ্যা কেরে বাপ?—সকলেই যে আমার মা! সেই ইচ্ছাময়ী মা-ই যে আজ এইরূপে এয়েচেন।—মা! বেশ্যারূপিণী পরমেশ্বরি! সন্তানকে স্তন্যদান কর।"[২০]

কুটিল প্রতুলের সর্পাঘাত হলে রামপ্রসাদের কবিরাজি গুণে আবার বেঁচে ওঠে। এক্ষেত্রেও ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রেমময় মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে রঙ্গমতী ও ডাক্তারের প্রেম এবং রঙ্গমতীর স্বামীত্যাগের কথা জানিয়েছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রতুল নিঃসহায় হয়ে ডাক্তার-রঙ্গমতীর বাগানবাড়িতে উপস্থিত হয়েছে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ডাক্তারের সঙ্গে স্ত্রীকে দেখে প্রতুলের আত্ম-অনুশোচনা আরো বেড়ে যায় : "অন্তরের অন্তর হইতে এতদিনে বুঝিল, ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ!"[২১] হঠাৎ প্রবল ঝড়ে বাড়ি ভেঙে রঙ্গমতীর মৃত্যু এবং বাইরে বজ্রাঘাতে ডাক্তারের মৃত্যু তাদের কর্মফলকে সুনিশ্চিত করে।

সপ্তম তথা শেষ পরিচ্ছেদে মানসিক বিকারগ্রস্থ প্রতুলকে দেখা যায়। মাঘী পূর্ণিমার দিনের ঘটনা। ঠাকুরের মন্দিরে বহু ভক্তসমাগম। সেখানে সকলের এঁটো পাতা খেয়ে বেড়ায় প্রতুল। আপন খেয়ালে ছুটতে গিয়ে পথে পড়ে পাগল প্রতুলের মৃত্যু হয়। শিষ্যেরা ধ্বনি তোলে—'কামিনী—জননী, কাঞ্চন—বন্ধন।'[২২] উপন্যাসের শেষ লাইনে আবার চমক দিয়ে যান লেখক : "সেই স্থান এখন পুণ্যতীর্থে পরিণত।"[২৩] পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়না এই স্থান দক্ষিণেশ্বর।

এই উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুররূপেই। চরিত্রের এতটুকু পরিবর্তন করেননি লেখক হারাণচন্দ্র রক্ষিত। কেবল নামটুকুই পরিবর্তন করেছেন। গ্রন্থশেষে শিষ্য রামচন্দ্র দত্তের মতো 'সেবক' লিখে স্বাক্ষর করেছেন। এতে লেখকের ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসে ঠাকুরের কথাগুলিই কেবল চলিত ভাষায় লেখা এবং ঠাকুর যেভাবে বলতেন সেভাবেই অনুকরণ করা। স্বাভাবিকভাবেই একথা স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণের কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাংলা কথাসাহিত্যে যেভাবে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন তা নিতান্তই অমূলক নয়, বরং অনেক বেশি প্রাণবান। এমনকী, পরবর্তী সময়ে এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ বিখ্যাত থিয়েটারেও অভিনীত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে

যেমন বাস্তবের চরিত্ররূপে প্রতিভাত হয়েছে, তেমনি সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও স্বীকৃত হয়েছে। উপন্যাসে তিনি সংলাপ ও ঘটনায় দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণসম সজীবতা লাভ করেছেন সার্থকভাবে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধানতম বাণী কামিনী ও কাঞ্চন পরিত্যাগের বিষয় ও তার সমস্যা-সমাধানের বিষয়টিও তাঁর ভাবাদর্শ অনুসরণে মূল ঘটনাটি পরিচালিত হয়েছে। সুতরাং সেদিক থেকেও বাস্তবের ভাবাদর্শ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হয়নি।

হারাণচন্দ্র রক্ষিতের অপর এক উপন্যাস 'ভক্তের ভগবান্'। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় এবং সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটি কলকাতা ৩৭ নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, 'স্বর্ণপ্রেস'-এ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত। এটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ডের নাম 'সাধনা ও সিদ্ধি', দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'লীলা ও আকর্ষণ' এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম 'ভক্তি ও ভক্ত-মহিমা'। গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখক বারংবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করেছেন :

> "যে মহাপুরুষের পদারবিন্দ ধ্যান করিয়া 'কামিনী ও কাঞ্চন' লিখিয়াছিলাম, সেই পুরুষোত্তমই আজ ভক্তবৎসল ভগবানরূপে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন;—তাঁহারই লীলামৃত অবলম্বনে 'ভক্তের ভগবান্' লিপিবদ্ধ করিলাম। অহেতুক কৃপাসিন্ধু কাঙ্গালের ঠাকুর তিনি;—মনে হয় এ কাঙ্গালকে কৃপা করিবেন।"[২৪]

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তথা শ্রীরামকৃষ্ণের ছায়াপাত ঘটেছে রামরূপ চাটুজ্জ্যে চরিত্রে। প্রথমেই তাঁর মা কালীর প্রতি আকূতি প্রকাশ পেয়েছে যা ইতিহাসের সত্য ঘটনা থেকে নেওয়া :

> "মা, আমায় ভক্তি দাও। তোমার ভালো নাও, মন্দ নাও, আমায় ভক্তি দাও। তোমার সু নাও, কু নাও, আমায় ভক্তি দাও। তোমার পাপ নাও, পুণ্য নাও, আমায় ভক্তি দাও।"[২৫]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃততেও দেখতে পাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই শুদ্ধাভক্তিকেই সারকথা বলেছেন, বলেছেন আর সব মিথ্যা। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী রূপ ভবানীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ রামরূপের এই আকূতি বহুবিদিত। প্রথম খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধিলাভের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর গর্ভগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন ও পঞ্চবটী প্রাঙ্গণে সাধনার কথা

ইতিহাসের ঘটনা মেনেই সচেতনভাবে রচনা করেছেন লেখক হারাণচন্দ্র। একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার কারণে যেরূপ তাঁর খ্যাপামি প্রচারিত হয়েছিল, বর্তমান উপন্যাসেও তার ছায়াপাত আছে। ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

> "সকলেই বলে, রামরূপ চাটুজ্জ্যে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। কি এক কামিনী-কাঞ্চন' যত অনর্থের মূল বলে, আর 'মা তুমি দেখো' বলে পাগলের মত প্রলাপ করে। ঘর-সংসারে মন নেই। যজমান শিষ্যিদের কাজে আটা নেই। নেওয়া-থোয়ার দিকে আদৌ লেহাজ-ই নেই। মার কান্নাকাটিতে বিয়ে কোল্লে, তা সে বউকে নিয়ে ঘরও কোল্লে না। আহা সতীলক্ষ্মী সে বউ; ভগবতীর মত রূপ; অনাথার মত বাপের বাড়ী পোড়ে রইল।"[২৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদের পটভূমি জয়রামবাটী—শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বশুরবাড়ি, লেখক নাম দিয়েছেন মিঠাপুর। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে যোগিনী ভৈরবীর কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর কাছে ব্রহ্মবিদ্যা বা তন্ত্রসাধনা শিখেছেন সেই ভৈরবীর চিত্র সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। রামরূপের কথায় ধরা পড়ে ভৈরবী প্রসঙ্গটি :

> "তবুও লোকশিক্ষার জন্যে, তুমি আমার শিক্ষায়িত্রী হ'য়ো। আমায় ব্রহ্মবিদ্যা শিখিয়ো। দেখ, বেদ পুরাণ তন্ত্র এ সব উচ্ছিষ্ট হোয়ে গেছে,—বাকী আছে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা। আমি নিরক্ষর, মূর্খ,—আমায় মুখে মুখে উহা শিখিয়ে যেয়ো। কেন না, শুনে শেখাই আমার পক্ষে উপযোগী হবে।"[২৭]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে রামরূপের শ্বশুরবাড়ির চিত্র ফুটে উঠেছে। সেখানকার বিখ্যাত দীঘির কথা যেমন আছে, তেমনি গ্রামের পরিচিতিও বর্তমান :

> "ক্ষুদ্র গ্রাম, পল্লীটি আবার ততোধিক ক্ষুদ্র। পাঁচ সাত ঘর ব্রাহ্মণ, ঘর দুই চার কায়স্থ, বাকী দশবিশ ঘর অন্যান্য জাতির বাস। একঘর ধনাঢ্য কৈবর্ত্ত্য তন্মধ্যে প্রধান। তাঁহারাই গ্রামের জমিদার।"[২৮]

শ্বশুরবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের যেরূপ পরিচিতি, লেখক হারাণচন্দ্র সেদিকটিও ভাবিত হয়েছেন। উপন্যাসে আছে :

> "জ্যোৎস্নারাত, তায় ফাল্গুনমাস, তায় নূতন জামাই নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে;—সুতরাং গ্রামময় একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। বিশেষ বিবাহের পর আট বৎসরের মধ্যে, জামাই এ-মুখো হন নাই। সুতরাং বিবাহ পুরাতন হইলেও জামাই সেই নূতনই আছেন তারপর এক গুজব উঠিয়াছিল যে, জামাই

কেমন এক ক্ষেপাটে রকমের—রাতদিন পূজাহ্নিক নিয়েই আছে, আর আপন মনে মা মা ক'রে কাঁদে।"[২৯]

বস্তুত এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অবিকল সত্য। একই সঙ্গে শ্রীমা সারদা দেবীর কথাও উঠে এসেছে। এখানে তিনি শিবাসুন্দরী নাম নিয়েছেন। ভৈরবীর সঙ্গে সারদা দেবীর যে সম্পর্ক বিরাজমান ছিল তা এই উপন্যাসে শিবাসুন্দরী ও যোগিনীর সম্পর্ককে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অংশেই লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের সারদা-পূজার কথা জানিয়েছেন। যোগিনী সরমার সাহায্য নিয়ে রামরূপ তাঁর সহধর্মিণী শিবাসুন্দরীকে প্রণাম করে বলেন :

"আজ শনিবার, মা পূজার প্রশস্ত দিন। তোমাকে আমার 'মা' হইতে হইবে। আজ হইতে তোমায় আমি এই পবিত্র সম্বোধন করিলাম। দেবি! আজ আমি মাতৃপদে—তোমার চরণ-সরোজে পুষ্পাঞ্জলি দিব। তবে লও মা, ভক্ত সন্তানের মানস-অর্ঘ্য! —আমি তোমায় বন্দনা করিয়া ধন্য হই।—জয় মা কালী, করালী, মহাশক্তি!"[৩০]

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সাধনা যেমন সত্য, তেমনি ইহলীলায় যুক্ত সকল অলৌকিকতাও সত্য। তাই কখনো তিনি জগতে আবির্ভাবের কারণটি ভাগবতের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আপনমনেই ভক্তের সম্মুখে বর্ণনা করেছেন :

"পবিত্র মাতৃভাবে আমায় গৃহী ও সন্ন্যাসীর দুই সাধনার আদর্শই দেখাইয়া যাইতে হইবে। কেননা অহংজ্ঞানে এখন পৃথিবী পূর্ণ। তাই আমার এ দীনবেশ—এ গুপ্ত নরলীলা।"[৩১]

দ্বিতীয় খণ্ডে লেখক আরো বেশি সক্রিয় হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিপূর্ণভাবে চিত্রিত করতে। এখানে এসে হারাণচন্দ্র সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণ নাম নিয়েছেন ও দেবত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে :

"সহসা কে এক সরল সাধুবেশধারী, —দিব্য আনন্দময় পুরুষ—সেইখানে আসিয়া, দিব্য, হাসি-হাসি মুখে কহিলেন, "বল—'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ'। সেই পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণ—সেই দয়াময়—করুণার সাগর—রামকৃষ্ণ—আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল গৃহীর পারের কাণ্ডারী।—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ।""[৩২]

এক আগন্তুকের কথায় আছে :

"ধ্যানে তিনি আমায় দেখা দিয়াছেন মাত্র। একাধারে রামকৃষ্ণরূপে দেখা দিয়াছেন। তবে শিশুরূপী এক নারায়ণের মুখে শুনেছি, তিনি সশরীরে, সহরের সন্নিকট—গঙ্গার ধারে—এক কালী-বাড়ীতে আছেন। অন্নপূর্ণার কালী বাড়ি;—দশ বৎসর ধোরে, লাখ্ লাখ্ টাকা ব্যয় কোরে, যা নির্ম্মাণ হোলো। মার পূজকরূপে,—নিরক্ষর দীন ব্রাহ্মণবেশে,—তিনি ঐখানে থাকেন।—হা প্রভু লীলাময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব! তুমি কখন কি রূপ ধরো!"[৩৩]

এই আগন্তুক আর কেউ নন—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের এই মানুষটি নিছক কালী পূজন নন—অবতার। নররূপে নরলীলা সাঙ্গ করার জন্য মর্ত্যে এসেছেন। উপন্যাসে বিজয়কৃষ্ণের নাম হয়েছে দেবেন্দ্রবিজয় গোস্বামী। তাঁর কথাতেই আবার রাম ও কৃষ্ণের সম্মিলীত রূপের আধার খুঁজে পাওয়া যায়। গোস্বামী বলেছেন : "যেই রাম, সেই কৃষ্ণ, দুয়ে মিলে রামকৃষ্ণ!"[৩৪] সরমার কণ্ঠেও লেখক গান বসিয়েছেন যা শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক। গানে আছে :

রামকৃষ্ণ রূপে নরদেহ ধরি,
এসেছেন হরি, চল দেখি রে।
বড় দয়া তাঁর, প্রেম-অবতার,
পতিতে উদ্ধার করেন ওরে।।"[৩৫]

বস্তুত মধ্যবিত্ত সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের জনপ্রিয়তার মূল কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরিত্রাণদাতার ভূমিকাটি। মধ্যবিত্ত জনসাধারণ মনে করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই পারেন সংসারের সকল কালিমা থেকে উদ্ধার করতে। যেকারণে বাংলা উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবেদন সে সময়ের প্রত্যক্ষ দলিল হয়ে ইতিহাস হয়ে গেছে।

উপন্যাসটিতে কথামৃতের পাশাপাশি উঠে এসেছে বহু গান যা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় গান এবং কথামৃতে একাধিক সময়ে উল্লিখিত। যেমন—'সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী', 'ভবে আসা, খেলব পাশা', 'এই সংসার মজার কুটী', 'ভেবে দেখ মন, কেউ কারো নয়', 'আপনাতে মন আপনি থেকো' ইত্যাদি।

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে ভক্তের কথা বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে যেরূপ তাঁকে নিয়ে একদল মাতামাতি করেছিলেন অবতারত্বের প্রশ্নে, অন্যদিকে বিপরীতবাদীরা তাঁর অবতারত্বকে স্বীকার করেননি। নাম পালটিয়ে সুনিপুণভাবে লেখক রামচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন ও ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রসঙ্গও এসেছে। দুই নগরবাসীর কথোপকথনে রামচন্দ্র দত্ত ওরফে উপন্যাসের রাম ডাক্তারের গৃহী হয়েও তাঁর ত্যাগের কথা আলোচিত হয়েছে। আবার সরাসরি নরেন দত্ত, রাম-রাখালের কথা এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে সূচিত করেছেন ডাক্তার সরকার নামে। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বিদ্যাসাগর, প্রতাপ মজুমদার ও শাস্ত্রী বা শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা। ঔপন্যাসিকের কলম-দক্ষতায় দুজনের কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিচিত করার বিভিন্ন দিকগুলি চিত্রিত হয়েছে।

বস্তুত সমগ্র উপন্যাসটিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্র রক্তমাংসের যেমন হয়ে উঠেছে, তেমনি দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বহু ঘটনা হুবহু চিত্রিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকেই যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুচর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছিল তা আর একবার প্রমাণিত হয়। যদিও উপন্যাসের গঠন সম্পর্কে লেখকেরই অন্যমত ছিল। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন :

> "এই গ্রন্থ ঠিক উপন্যাস নয়, উপকথা নয়, ইংরেজী রোমান্সও নয়, খাঁটি ভগবৎ প্রেম বা ভক্তিতত্ত্ব। সে তত্ত্বও আবার যে সে লোকের লেখা নয়,—স্বয়ং ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব কথামৃত তাহার উপাদান।"[৩৬]

তবে লেখক এরূপ দাবি করলেও 'ভক্তের ভগবান্' উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যসকল পূর্ণ করেছে, যেকারণে তাকে উপন্যাস বলতে দ্বিধা হয় না।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন তাই একদিকে উপন্যাসে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র কোনোরূপ পরিবর্তিত না হয়েই ঘটনাক্রমে প্রবেশ করেছে, তেমনি ভক্তির কারণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারত্বকে কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করতে সহজতা লাভ করেছে। কিন্তু সমকালীনতার নিরিখে উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এভাবে এত পরিপূর্ণভাবে ও অপরিবর্তিত হয়ে আসাটা বোধহয় হারাণচন্দ্র রক্ষিতের উপন্যাসেই প্রথম ঘটেছে। সেদিক থেকে হারাণচন্দ্রের দুটি উপন্যাসই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(২)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-কাহিনিকে উপন্যাসের আদলে গ্রন্থ রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন কল্লোল যুগের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)। বলাবাহুল্য, যেসময়ে বাংলা সাহিত্যের নব নব দিগন্তের সূচনা দেখা যাচ্ছে এবং প্রথাগত বিষয় আশয় ভেঙে নতুন আঙ্গিক ও ভাব দেখা দিচ্ছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ব্যাপক প্রভাবের কারণে, সেইসময় সেই দলেরই একজন হয়ে অচিন্ত্যকুমার ধর্মীয় জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্বের জীবনী লিখলেন। শুধু জীবনী নয়, গল্প বলার মতো করে আপন সৃষ্টির জগতে অবাধ বিচরণের মধ্য দিয়ে পরমহংসের জীবনীকে তুলে ধরলেন আপামর জনসাধারণের কাছে। তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ চার খণ্ডের ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’।

‘মাসিক বসুমতী’ পত্রিকায় ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রকাশিত হয় পরের বৎসর ১৩৫৮-এর ৬ ফাল্গুন সিগনেট প্রেস থেকে। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে সাড়া পড়ে যায়। সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির মুদ্রণ কপি পরিমাণ দেখলে বোঝা যায় এর জপ্রিয়তার স্থান। প্রথম প্রকাশে (৬ ফাল্গুন ১৩৫৮) ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয় পাঁচ হাজার কপি। এর ঠিক কুড়ি দিনের মাথায় দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরোয়। মুদ্রিত হয় চার হাজার পাঁচশ কপি। তৃতীয় মুদ্রণ হয় ৮ বৈশাখ ১৩৫৯। সংখ্যা সাত হাজার নয়’শ কপি। চতুর্থ মুদ্রণ ৬ ভাদ্র ১৩৫৯, কপি দশ হাজার একশ। ভাবলে অবাক হতে হয়, মাত্র এক বৎসরের মধ্যে এরূপ বিক্রি বাংলা সাহিত্যে আর কোনো গ্রন্থের ক্ষেত্রে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। পরবর্তীকালে অখণ্ড আকারে প্রকাশ করেন মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে যখন অখণ্ড আকারে তা প্রকাশিত হয়, তখনও তার জনপ্রিয়তা কমেনি, বরং অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ১ বৈশাখ মিত্র ও ঘোষের কাউণ্টারে হাজার হাজার লোকের জমায়েত হয়। মাত্র এক দিনেই বিক্রি হয় ছয় হাজার কপি। সুতরাং গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা নিয়ে যেমন কোনো প্রশ্ন আসে না, তেমনি এই জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে গ্রন্থটির সাবলীলতাকে, যা সকলের কাছে সমাদরের বস্তুতে পরিণত করেছে।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তুতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। প্রথম খণ্ড শুরু হয়েছে গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের কলকাতা আগমনের মধ্য দিয়ে। ফ্ল্যাশ ব্যাকে উঠে এসেছে গদাধরের পূর্ব জীবনের তথা জন্ম ও শৈশবের কাহিনি। শেষ হয়েছে শ্রীমা সারদাদেবীকে ষোড়শোপচারে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা দিয়ে অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবনের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ড এরপর থেকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তৃতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যুর প্রসঙ্গ দিয়ে। শেষ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ক্ষত ও ব্যথার উপক্রমের মধ্য দিয়ে। চতুর্থ খণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শেষ অংশ এবং শেষ অমৃত যা কথামৃতে বিধৃত। খুব সহজ করে বললে হয়, প্রথম খণ্ডে গদাধরের সাধনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে ওঠা, দ্বিতীয় খণ্ডে পরমহংসদেব পরিচিতি লাভ, তৃতীয় খণ্ডে ভক্ত সমাগম ও আকর্ষণ এবং চতুর্থ খণ্ডে অন্ত্যজীবনের পার্থিব যন্ত্রণা ও অমৃতবাণী বর্ষণ। চারখণ্ডে এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনকে তুলে ধরেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর তাঁর জনপ্রিয়তা যে এতটুকু কমেনি তার প্রমাণ প্রধান কয়েকটি গ্রন্থের বিপুল প্রচার—এক, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', দুই, 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' এবং তিন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'। তবে শেষ দুটি গ্রন্থ সাহিত্যের ধারায় জীবনী গ্রন্থ রূপে আখ্যাতিত হলেও 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' বাংলা সাহিত্যে অন্য মাত্রা নেয়। তথাকথিত জীবনী সাহিত্য থেকে সরে এসে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' মুখের ভাষা অবলম্বন করে রচিত হয়। কল্লোল যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যখন কাব্যজগতের মহাকাশে আপনাকে স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ করতে তৎপর, সেইসঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যেও নতুন আঙ্গিক ও বিষয় আনতে সক্ষম হন। যেকারণে অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এসে পড়েছে জীবনী সাহিত্যও। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, নজরুল, বিবেকানন্দ, সারদাদেবী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথ, চৈতন্যদেব প্রমুখের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনায় সার্থক বিচরণ করেছেন। তবে অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ থেকে এর পার্থক্য বহুগুণ। প্রথম বিষয় এর ভাষা। কথাসাহিত্যের ভাষাগত উপাদানকে গ্রহণ করে অচিন্ত্যকুমার 'পরমপুরুষ'-এ ভাষার কোমলতা ও তীব্রতাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মুখের কথাকে সাবলীলভাবে বলার ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হয়ে উঠেছে চলমান জীবনী। তথ্য নয়, গল্প রচনাতেই সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছেন লেখক। তাই তাঁর লেখনীতে উঠে আসে ভাষার সরলতা, মাধুর্য। প্রথম খণ্ডের সূত্রপাত যেভাবে হয়েছে খণ্ডের শেষ অবধি তার ধারাটিও সমান তালে সংরক্ষিত থেকেছে। লেখক শুরু করেছেন এইভাবে :

"তোকে কলকাতায় নিয়ে এলাম। দেখেছিস?

মস্ত শহর কলকাতা। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। না দেখে উপায় কি?

এ কি আমাদের কামারপুকুরের মত নিঝঝুম? নিরিবিলি?

রামকুমার চিন্তিত মুখে বললেন, 'কলকাতায় এসে টোল খুললাম—'"[৩৭]

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাগুলিও জ্যান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। নরেনের ঈশ্বর খোঁজা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি সংলাপ দেখা যেতে পারে :

"'বলিস কিরে! কথা হয় যে!'

'কথা কয় না কচু!' কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল নরেন্দ্র।

'সব আপনার মাথার খেয়াল!'

বলে কি ছোঁড়া! মাথার খেয়াল?

'বলিস কি রে! মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন-চলেন, কথা কন—'

'বাজে কথা, মাটির প্রতিমা নড়বে-চড়বে কি! কথা কইবে কি!'

'বাঃ, নিজের চোখ-কানকে অবশ্বাস করব?'

'মাথার গরমে ছায়া দেখেন আপনি, হয় তো বা অপচ্ছায়া!' নরেন নিষ্ঠুরের মত বললে,

'হাওয়াতে হয়তো বা কি শব্দ হয়, ভাবেন ছায়া বুঝি কথা কইছে।'

'তুই বললেই হল?' নরেনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন রামকৃষ্ণ।"[৩৮]

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় বাণীগুলিও কথামৃত অনুসরণে লেখা। তবে তা বেশ কিছু ক্ষেত্রে আরও সরল অর্থ বিশিষ্ট শব্দ কম-বেশি লেখাপড়া জানা সকল পাঠকের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে গ্রন্থটি। এই কারণেই গ্রন্থটি জীবনী সাহিত্য ছাড়িয়ে অনেক বেশি সরস গল্পময় কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে এসে ধরা দেয়। ঘটনার উপযুক্ত পরিবেশ রচনাতেও তার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। একটি দৃশ্যে পাওয়া যায় :

"তিনদিন পরে ঠাকুর ফিরছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের নৌকাতে গোলাপ-মা, গোপালের মা আর একটি-দুটি ভক্ত বালক। আশ্চর্য, গোপালের মা'র হাতে একটি পুঁটলি। কি করবে, বলরামের বাড়ির মেয়েরা বেঁধে দিয়েছে! খান দুই কাপড় রাঁধবার জন্যে কিছু হাতা-খুন্তি।"[৩৯]

কিংবা

"গান শেষ হওয়া মাত্র নরেনের হাত ধরল রামকৃষ্ণ। হাত ধরে টেনে আনল উত্তরের বারান্দায়। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল ঘরের দরজা। শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া আটকাবার জন্যে থামের ফাঁকগুলো ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা। নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি জায়গা। ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবার পর কারু সাধ্য নেই এখানে উঁকি মারে। নিরিবিলিতে কিছু উপদেশ দেবে বোধ হয় রামকৃষ্ণ, নরেন তাই কৌতূহলী হয়ে রইল।"[৪০]

অন্যদিকে লেখকের মনন ও তার প্রতিফলন ঘটেছে আপন ভাষায়। সেখানে জটিলতা নেই, বরং কথার কথায় জটিল বিষয়ও সহজ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র রচনায় লেখকের এই মননশীল ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বারংবার, অথচ এতটুকু ঘটনার বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়নি, বরং নিরবচ্ছিন্ন সূত্রতার কাজ করেছে। একটি উদাহরণ থেকে তা বোঝা যেতে পারে :

"ছোট-ছোট বেড়া তুলে দিয়েছে আমাদের চার পাশে। ধনের বেড়া মানের বেড়া অহঙ্কারের বেড়া। তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষার শুকনো খড়কুটো দিয়ে চাল ছেয়ে দিয়েছ মাথার উপরে। আশে-পাশে ছোট-ছোট সুখ-দুঃখের ঘুলঘুলি বসিয়েছ, মৃত্তিকার মেঝেটি শীতল করে লেপে দিয়েছ স্নেহ-প্রেমের সিঞ্চনে। এমনি করে অপরিসর ঘরের মধ্যে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি দূরে সরে দাঁড়িয়েছ। সরে না দাঁড়িয়েই বা করবে কি! তোমার কি দোষ! আমরাই যে অশক্ত, অসমর্থ... তেমনি ঈশ্বর, এই মায়াময় সংসার সৃষ্টি করে তুমি আমাদের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করেছ। তোমাকে ভুলে থাকবার খেলায় অষ্টপ্রহর মেতে আছি আমরা। ...পদ্ম যেমন সূর্যকে দেখে, তেমনি করে দেখতে দাও তোমাকে। তুমি অপাবৃত হও, উদ্ঘাটিত হও, দূর করে দাও এই আচ্ছাদনের কুহেলি।

"সারদা হঠাৎ মুখের ঘোমটা খুলে দাঁড়াল রামকৃষ্ণের সামনে।"[৪১]

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদর্শনের ঈপ্সা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছালে এরূপ ভাবনা তাঁর অন্তরে জাগরুক হওয়া অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু লেখকের কলমে সাধারণ পাঠকের কাছে দীর্ঘ বর্ণনা ও মনন ভঙ্গিমা এতটুকু ক্লান্তি আনে না, বরং উপন্যাসের প্রশান্তিকে সূচিত করে। তাই গ্রন্থটি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত।

অচিন্ত্যকুমারের অপর গ্রন্থ 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ)। তবে এই গ্রন্থটি 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'-এর মতো তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। মিত্র ও ঘোষ-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি' বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অচিন্ত্যকুমারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অচিন্ত্যকুমার বিষয় নির্বাচন করেন 'কবি রামকৃষ্ণ'। সেই বক্তৃতার গ্রন্থরূপ প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬০ বঙ্গাব্দে। এরূপ বিষয় নির্বাচনের পেছনেও লেখকের অদ্ভুত এক ভাবনা কাজ করে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

> "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ। যিনি দেখেন জানেন প্রকাশ করেন তিনিই কবি। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন, জেনেছেন, প্রকাশ করেছেন। তিনি সর্বদর্শী, সর্বানন্দী, সর্বানুভূ। ... সুন্দরের চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দময়ের সত্তা দিয়ে জেনেছেন, সীমাহীন সরলের ভাষায় বলেছেন সুষমান্বিত করে। বিহিত অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। পূজার শেষে যেন প্রসাদী ফুল হতে পারি বনের ফুলের এই শুধু নিবেদন।"[৪২]

বস্তুত অচিন্ত্যকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে, এই গ্রন্থেও তিনি সেভাবেই পরমপুরষ রূপেই চিত্রিত হয়েছেন। তবে ভাষা পূর্বের ন্যায় সরলতায় ভরা নয়। তত্ত্বকথা সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরস নির্যাস। সেদিক থেকে উপন্যাসের আবহ খানিকটা হলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থের সূচনায় লেখক যেভাবে কবিকে ঋষির সঙ্গে তুলনা করে স্বাভাবিকতায় পৌঁছেছেন, সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের সেই দৃষ্টিভঙ্গিই সক্রিয় থেকেছে।

আবার গল্পের আঙিকে যখন লেখক কথা বলেন তখন নিতান্তই সরলবৎ মনে হয়। ঊনষাট অধ্যায় থেকে একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

> " বিশ্বম্ভরের মেয়ে, ছ-সাত বছর বয়েস, প্রণাম করল রামকৃষ্ণকে। বললে অভিমানের সুরে, 'আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলে না!'
>
> 'কই দেখিনি তো!' বললেন রামকৃষ্ণ।

'তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি।' বললে সেই বালিকা। 'দাঁড়াও এ পা-টা করি।' রামকৃষ্ণ আভূমি মাথা নুইয়ে কুমারীকে প্রতিনমস্কার করলেন। বললেন 'গান জানো? গান গাও।'

মেয়েটি বললে, 'মাইরি, গান জানি না।'

রামকৃষ্ণ আবার অনুরোধ করলেন।"[৪৩]

লক্ষ করার বিষয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কবিত্বকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে লেখক একদিকে যেমন তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন প্রয়োজনের সাপেক্ষে, তেমনি অন্যদিকে উঠে এসেছে কথার কথা, জীবনের কথা। ফলত গ্রন্থটি উপন্যাসের দিকে ক্রমশ প্রবাহিত হয়েছে।

কখনো অধ্যায় নির্বাচন করে লেখক যুক্তির সাপেক্ষে গল্প করেছেন। সেগুলি যেমন প্রাসঙ্গিক হয়েছে, তেমনি মূল সূত্রের সঙ্গে সহজেই গ্রথিতও হতে পেরেছে। যেমন নয় অধ্যায়ে লেখক বলেছেন : "সেই শক্তির নাম মহামায়া। ব্রহ্মের চেয়ে মহামায়ার জোর বেশি। কি রকম? রামকৃষ্ণ বললেন, 'জজের চেয়ে প্যায়দার বেশি ক্ষমতা।'..."[৪৪]

বিচিত্র উপমা দিলেন রামকৃষ্ণ : 'যেন পানা ঢাকা পুকুর। পানা ঢাকা পুকুরে ঢিল মারলে ...'[৪৫]

... দুটি সরল-সুন্দর গল্প বলেছেন রামকৃষ্ণ : 'এক গুরু শিষ্যবাড়ি যাচ্ছেন, সঙ্গে চাকর নেই। ...'[৪৬]

এভাবেই একদিকে যেমন অন্তঃসলিলার মতো লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রবাহিত হয়েছে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের বলা গল্প ও জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরবচ্ছিন্নভাবে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে ক্রমবিস্তৃত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপুরুষ রূপটি যেমন নিখুঁত চিত্রিত হয়েছে, তেমনি উপন্যাসটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

অচিন্ত্যকুমার আরও কয়েকটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মা সারদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেমন—'সকলের রামকৃষ্ণ', 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র', 'ভক্ত বিবেকানন্দ', 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ', 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীসারদামণি মাতাঠাকুরাণী' ইত্যাদি। 'সকলের রামকৃষ্ণ' সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখা জীবনী সাহিত্য। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন ও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসকল উল্লেখ করে গ্রন্থটি হালকা চালে রচনা করেছেন অচিন্ত্যকুমার। গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সকলের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণকে তুলে ধরা, তাই কয়েকটি প্রধান ঘটনাকে অবলম্বন করে ও শিরোনাম দিয়ে

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আবার 'ভক্ত বিবেকানন্দ' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রধান চরিত্র হলেও তাঁর মহাপ্রাণতা ও গুরুসুলভ আচরণকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানেও বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও তাঁর ভাবাদর্শ অনুসরণ করে বিবেকানন্দের বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার কিছু ঘটনা ও মনন চিত্র ফুটে উঠেছে। তবে 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র'-তে কীভাবে বিশ্বাস আর ভক্তির জোরে গিরিশচন্দ্র রত্নাকর হয়ে উঠেছেন, তার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। সেদিক থেকে ভূমিকা অংশে লেখক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কারুর ভাব নষ্ট না করে অভিনব চিকিৎসায় নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে লোকসেবায় নিয়োজিত করেছেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মুখ্য চরিত্র না হলেও তিনিই গিরিশচন্দ্রের ভাবমূর্তি পরিবর্তনের একমাত্র রূপকার। সেদিক থেকে তিনি গিরিশ ঘোষের আদর্শ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তবে অলৌকিকত্ব নয়, বরং পরমপুরুষের পরম স্পর্শ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের জীবনকে সার্থক করে গড়ে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠেছেন।

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন কাহিনি হলেও প্রসঙ্গক্রমে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন, তেমনি তাঁর ভাবাদর্শের বিস্তৃত পরিসরে নরেনের বড় হয়ে ওঠা ও স্বামী বিবেকানন্দ হয়েও গুরুদেবকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গুরুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীসারদামণি মাতাঠাকুরাণী' গ্রন্থটিতেও প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন সারদাদেবীর পতি হিসেবে কেবল নয়, বরং শিক্ষাগুরু হিসেবেও। সেইসূত্র ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমপুরুষ রূপটি প্রকাশিত হয়েছে।

(৩)

বাংলা কথাসাহিত্যের অপর এক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯)। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামীণ সমাজের ভাঙা-গড়াকে তিনি উপলব্ধি করেন, বিশেষত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বকে তিনি গভীরভাবে লক্ষ করেন। আর তারই প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে তাঁর উপন্যাসগুলিতে। মধ্যবিত্ত জনজীবনে সংকট ও দ্বন্দ্বকে কথাসাহিত্যের মোড়কে যেভাবে তুলে ধরতে

সক্ষম হয়েছিলেন অমলেন্দু চক্রবর্তী, তাতে তাঁর লেখনী দক্ষতা প্রকাশ পায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিপন্ন বিস্ময়' (১৯৬০)। এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল—'আকালের সন্ধানে'(১৯৮২), 'গোষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন' (১৯৮৪), 'যাবজ্জীবন'(১৯৮৪), 'চাঁদ মনসার জোট'(১৯৮৮), 'রাধিকা সুন্দরী' (১ম খণ্ড-১৯৯৬,২য় খন্ড-১৯৯৭), ইত্যাদি। তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'অবিরত চেনামুখ'(১৯৮৬), 'গৃহে গৃহান্তরে' (১৯৮৭) প্রভৃতি। ঔপন্যাসিক অমলেন্দু চক্রবর্তী 'অজাতশত্রু' ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই ছদ্মনামেই তিনি লেখেন গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীমূলক উপন্যাস 'গদাধর'।

'গদাধর' দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে রথযাত্রার দিন। প্রকাশক-শ্রী কমলেশ চক্রবর্তী, কল্পতরু প্রকাশনী। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় পরের বছর একই দিনে একই প্রকাশনী থেকে। দুই খণ্ডেই লেখা 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা কাহিনী'। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে এটি সন্ত জীবনী। সুতরাং অলৌকিকতায় ভরা নিছক একটি জীবনী গ্রন্থ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু গ্রন্থের ভূমিকাতে লেখক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সে বিষয়েই, যা পড়ে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন গ্রন্থটি নিছক সন্ত জীবনী নয়। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন :

> "ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত জীবনী নিয়ে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিই গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারপর আবার আমি কেন লিখলাম সেই কৈফিয়ৎ দেবার জন্যই এইটুকু লেখা।
>
> "ঠাকুরের পূত জীবন নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা হ'লেও, তাঁর জনক জননী, পারিবারিক ও বাল্যজীবন নিয়ে একমাত্র স্বামী সারদানন্দ মহারাজ রচিত "রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে বিশদভাবে কেউ লেখেন নি বা কেউ লিখলেও সে কথা আমার জানা নেই।
>
> "আবার বাল্যজীবনের অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা যা শ্রী অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় রচিত "রামকৃষ্ণ পুঁথিতে" পেয়েছি তা আবার "রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" উল্লেখ নেই। আমি উভয় গ্রন্থের ও শ্রীবৈদ্যনাথ লাহা মহাশয়ের লেখা "কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ" ইত্যাদি রচনা থেকে ঘটনাগুলো নিয়ে কাহিনীর মত ক'রে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে গেছি। ঘটনাগুলো কোনটাই আমার মানস কল্পিত নয়। তবে কারণগুলোতে ও চরিত্রকে বিশেষ ভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে কিছু কিছু কল্পনার সাহায্য নিয়েছি।"[৪৭]

বলাবাহুল্য, লেখকের লেখাতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে— ইতিপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও পারিবারিক জীবন নিয়ে সেভাবে কোথাও কোনো আলোচনা হয়নি এবং দুই, বিভিন্ন প্রচলিত গ্রন্থ

থেকে জীবনী সংগ্রহ করে তা নিজের মতো প্রয়োজন বিশেষে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কল্পনা কেবল ঘটনার কারণ ও চরিত্রকে রক্তমাংসের করে তোলার জন্য। কল্পনা কখনই কার্য হয়ে ওঠেনি। তাই একদিকে যেমন গদাধরের জীবন বিকৃত হয়নি বা অনৈতিহাসিক হয়ে ওঠেনি, অন্যদিকে তেমনি অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। আবার কারণের আধারে যে কল্পনা লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন তাও বাস্তবোচিত মনে করেই সংযুক্ত করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখকের সেই প্রেক্ষিতেই স্বীকারোক্তি :

> "কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, কিন্তু কোনো গ্রন্থেই ঘটনার কারণ উল্লেখ নেই। আমি সেই কারণগুলোকে ও ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কিছু-কিছু বাস্তবধর্মী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছি।"[৪৮]

ফলে আর পাঁচটা জীবনী গ্রন্থকে ছাড়িয়ে কথাসাহিত্যের ভঙ্গিমায় যে চরিত্রখানি উঠে আসবে সে বিষয়ে লেখক ভূমিকাতে পাঠককে নিশ্চিত করেছেন। অবশ্য গ্রন্থপাঠে লেখকের কথাকে স্বীকার করে নিতেই হয়, সেই দিকটিই আমাদের দেখার বিষয়।

'গদাধর' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে গদাধরের পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি গদাধরের কলকাতা গমনের প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত। প্রথম খণ্ডে গদাধরের গল্প থেকেও বেশি আছে তাঁর পরিবারের কথা। পিতা ক্ষুদিরাম, মাতা চন্দ্রমণি দেবীর পারিবারিক জীবনকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। লেখকের লেখনীর দক্ষতায় খণ্ড চিত্রগুলি যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

> "সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ক্ষুদিরাম তখনও ফেরেনি। চন্দ্রমণির উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। নানা আশঙ্কা মনের মধ্যে ঘনিয়ে আসে। রঘুবীরের সন্ধ্যারতির আয়োজন করতে করতে বার বার শুধু কাত্যায়নীর কথাই মনে হয়। রঘুবীরের পাদপদ্মে মনটাকে নিবিষ্ট রাখতে পারে না। ঘন ঘন ব্যাকুল দৃষ্টিতে সদরের দিকে চায়। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারও বাড়ি নেই, যে তাকে এগিয়ে খোঁজ নিতে ব'লবে। আর কনিষ্ঠ রামেশ্বর বালক, তাকে এগিয়ে দেখতে ব'ললে সে হয়তো যাবে, কিন্তু তাকে পাঠিয়ে আর এক দুশ্চিন্তা।"[৪৯]

বস্তুত উপন্যাসের সব চরিত্রগুলিই ইতিহাসের হয়েও বাস্তবোচিত হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট যে এ বিষয়ে লেখক সর্বদা সচেতন ছিলেন। মেয়ে কাত্যায়নীকে ভূতে ধরা এবং ভূত ছাড়ানো কিংবা ধর্ম্মদাসের সঙ্গে গয়া যাবার পরিকল্পনা করা কিংবা চন্দ্রমণির গর্ভাবস্থা ও প্রসব যন্ত্রণা

উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে গল্পের আবহে অসাধারণ চিত্র ভঙ্গিমায় ও চরিত্রের সংলাপে পরিবেশিত হয়েছে। সেদিক থেকে কথাসাহিত্যের মর্যাদাকে লেখক এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

আবার গদাধরও পণ্ডিতমশায়ের অনুকরণ করে যেভাবে বন্ধুদের কাছে হাসির রোল তুলত কিংবা বাগানে বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত তা নিছক সাধারণ একটি ছেলের বাল্যস্বভাবের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। লেখকও উপযুক্ত কল্পনায় ও প্রকৃতির আবহে গল্পগুলিকে গ্রন্থন করেছেন। আটত্রিশতম অধ্যায়ে লেখকের প্রকৃতির মুগ্ধ বর্ণনা অমলিন :

> "এমনি ক'রে বর্ষা যায়, শরৎ আসে। আকাশ আবার সুনীল হয়। নিবিড় কালো মেঘের আস্তরণ ছিঁড়ে তপনদেব বেরিয়ে আসে। ধরণীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। মেঘগুলো খণ্ড খণ্ড হ'য়ে সারা আকাশময় ছুটাছুটি করে। কখনো কখনো সূর্যদেবকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়। কিন্তু আগের মতন আর নিষ্প্রভ ক'রতে পারে না— দুষ্টু ছেলের মতন একটু বিরক্ত ক'রে আবার ছুটে পালায়। সবুজ ধানের ক্ষেত পীতাভ হ'য়ে উঠে। ফলভারে নত হ'য়ে পড়ে। কদম ঝড়ে, শেফালী ফোটে। দোয়েল, শ্যামা মুখর হ'য়ে কলগুঞ্জন করে। ধরিত্রী বেশ-পরিবর্ত্তন ক'রে দাঁড়ায়। গদাধর কবি। বেশ-পরিবর্ত্তন দেখে মুগ্ধ হয়।"[৫০]

এরূপ সৌন্দর্যচেতনা গদাধরের দৃষ্টিতে লেখকের মনোভাবনার পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

প্রথম খণ্ডের শেষে ক্ষুদিরামের মৃত্যু হলে সবাই হাহাকার করে উঠলেও গদাধরের অনুভূতিতে যে সেরকম ছাপ পড়েনি তা জানিয়েছেন লেখক। কারণ সে নিতান্তই ছোট। তার বোঝার ক্ষমতা তেমন নেই। লেখকের বাচনভঙ্গিতে চিত্রিত হয় :

> "গদাধর তখন জানতেও পারে না যে, তার জীবন-বীণার একটি তার ছিঁড়ে গেল। আদর, আব্দার, অভিমান জানাবার পাত্র চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।"[৫১]

সেদিক থেকে প্রথম খণ্ডে গদাধর নিতান্তই বালক। বালকোচিত বৈশিষ্ট্যসকল লেখকের গুণে সার্থক প্রতিফলিত হয়েছে এই খণ্ডে।

দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে ঠিক এর পরের অংশ দিয়ে। প্রথম খণ্ডে সরাসরি মৃত্যুর কথা থাকলেও দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতে উঠে এসেছে মৃত্যুসংবাদ শুনে স্ত্রী চন্দ্রমণির অস্ফুট আর্তনাদ, রামেশ্বরের যন্ত্রণা, পুত্রবধূর কান্না, প্রতিবেশীদের হাহাকার। গ্রামীণ জনজীবন যেভাবে প্রথম খণ্ডে ধরা পড়েছে, দ্বিতীয়

খণ্ডেও তার অন্যথা হয়নি। বিশেষত প্রতিবেশীদের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায়-পরিবার সঙ্গে যেভাবে একাত্ম হয়ে ওঠেছে উপন্যাসে, তা কথাসাহিত্যের সামাজিক আবেদনকে পূর্ণ করে তোলে। সমকালীন কামারপুকুরের জনজীবন বিধৃত হয়েছে উপন্যাসের পাতায় পাতায়। অন্যদিকে তারই প্রকাশে গদাধরের আত্মপ্রকাশ সহজ হয়ে ওঠেছে। ক্ষুদিরামের মৃত্যুর শ্রাদ্ধ-শান্তির অনুষ্ঠানও এ থেকে বাদ যায়নি। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচলিত বৃষোৎসর্গও করা হয়েছে। সে চিত্রও অনবদ্য। গ্রাম বাংলার এই প্রথা বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু ঔপন্যাসিক অমলেন্দু চক্রবর্তীর কলমে তা অসাধারণ ভঙ্গিমায় পরিচিতি লাভ করেছে।

তবে গদাধরের কলকাতা গমনের সময় যত নিকটতর হয়েছে ততই গদাধরের কৈশোর ও যৌবনের গল্প শেষ হয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত তত বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। একই অধ্যায়ে বছরের পরিবর্তনও হয়েছে। ক্রমশ দাদা রামকুমারের হাত ধরে কলকাতা গমনের দৃশ্য এসে পড়ে। গদাধরের নিঃশব্দ গমনে মা চন্দ্রমণি কাতর হয়ে পড়েন। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় লেখকের ভাবীকালের প্রতি ইশারার পুনরাবৃত্তি :

> " ক্রমে ক্রমে ওরা দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যায়। ..... দীর্ঘশ্বাসটা চেপে কোঁছার খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে বেদনাকে ছেড়ে ফেলে ভাবীকার পরমহংস অজানা মহানগরের উদ্দেশ্যে দাদাকে অনুসরণ ক'রে দ্রুত এগিয়ে যায়, আর ভাবে—কে জানে, তার স্বপ্ন সত্য হবে কি না?"[৫২]

এভাবেই চন্দ্রমণি দেবীর চোখের জল যেমন গ্রাম-বাংলার মায়ের আত্মযন্ত্রণার চিত্রকে মনে করায়, তেমনি দাদা রামকুমারের অর্থ উপার্জন করার উপায় ভাবনা, ক্ষুদিরামের পিতৃত্বসুলভ পৌরহিত্যের জীবন বর্ণনা, গ্রামের অন্যান্য পরিবারগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন উপন্যাসের সকল লক্ষ্মণকে পূর্ণ করে। যাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস, সেই গদাধরের জীবন-পর্ব যেমন সন্তজীবনের জীবনী হয়ে ওঠেনি, তেমনি গদাধর সম্পূর্ণভাবে রক্তমাংসের বাস্তবোচিত বালকরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি সার্থকভাবে কথাসাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে।

(৪)

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—'মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', 'পরমারাধ্য শ্রীমা', 'যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ', 'মুক্তপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা', 'বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া', 'সবার মা সারদা', 'রূপ হতে অরূপে' ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণবিষয়ক তাঁর প্রধান রচনা 'মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ'।

'মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৫ আগষ্ট ১৯৫৬। প্রকাশক শ্রীতপন বারিক, অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা। গ্রন্থটি সুন্দর ছোট ছোট বাক্য নিয়ে রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে অবলম্বন করে লিখিত হলেও এই গ্রন্থটিও জীবনীগ্রন্থ হয়ে ওঠেনি, বরং তা ছাড়িয়ে কথাসাহিত্যের আঙিনায় পৌঁছে যায়। সঙ্গে কবিত্বের সরসতা। গ্রন্থের প্রথম অংশটি দেখলেই প্রমাণ পাওয়া যায় :

> " ' তোমার পুত্র হয়ে তোমার বাড়িতে গিয়ে জন্মাব। সেবা নেব।'
>
> চমকে ওঠেন ক্ষুদিরাম।
>
> তাকান ফিরে—
>
> ফিরে তাকান ঘুম ঘুম চোখে।
>
> নিদ্রা নয়। ঘুম নয়। নয় কো তন্দ্রা। যেন কিসের আবেশে অবশ হয়েছে তাঁর দেহ।
>
> ধীরে ধীরে এলেন চলে-
>
> চলে এলেন সুপ্তির সমুদ্র থেকে চেতনার তীর্থে। তাকালেন দুটি চোখ মেলে। এলো চোখে জল। জাগল বুকে প্লাবন। অধীর আকুল হল ক্ষুদির অন্তর। "[৫৩]

কবিতার ভাষা দিয়ে যে রচনার সূত্রপাত, রচনার শেষ পর্যন্ত তার সুর অবিকৃত এবং নিরবছিন্ন অবস্থায় থেকে গেছে। পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই উপন্যাসের শুরু ক্ষুদিরামের স্বপ্ন দিয়ে, শেষ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃমন্দিরে মা কালীতে গুরু তোতাপুরীর বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। প্রথম সাত অধ্যায়ে গদাধরের কামারপুকুর জীবনের শেষ।

তবে সমগ্র উপন্যাস জুড়ে যে কাব্যিক সুর প্রবাহিত হয়েছে, সেই সুর থেকে চরিত্রের সংলাপগুলিও বাদ পড়েনি। চৌত্রিশতম অধ্যায়ে একটি দৃশ্যে বর্ণিত হয়েছে :

"গদাধর একহাতে একমুঠা মাটি, আর হাতে একটি টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—

দুটোই মায়ার পাশ! মাকে পাওয়ার অন্তরায়। মাকে পেতে হলে পাশমুক্ত হতে হয়।.....

বল্ মন, কোনটা নিবি- টাকা চাই? মাকে ছেড়ে এই মায়ার সংসারে মজে থাকবি?

মন বললে- না, না, না। না টাকা। না মাটি। না কাঞ্চন। না কাম। আমি চাই তোমাকে। তুমি টেনে নিবে কোলে। জড়িয়ে ধরবে বুকে।....."[৫৪]

আবার অন্যান্য চরিত্রের সংলাপগুলিতে একই রকম সুর ধরা পড়ে, যেকারণে লেখকের বর্ণনা ও চরিত্রের সংলাপ এক হয়ে যায়। অবশ্যই এই বৈশিষ্ট্য গ্রন্থটিকে একদিকে যেমন উপন্যাস হতে বাধা দেয়, তেমনি অন্যদিকে চারিত্রিক দৃঢ়তাকেও প্রায় অস্বীকার করে।

আবার প্রকৃতির আবহ রচনায় লেখকের কাব্যময়তা সুন্দর রূপ ধারণ করে। সতেরতম অধ্যায়ে গদাধরের পঞ্চবটী বনে সাধনাকালের একটি দৃশ্যে তা প্রকাশ পায় :

"ঊষাক্ষণ। পাখি ডাকছে। হাওয়া বইছে ঝিরঝির করে। উল্লোলা গঙ্গা, গদাধর ফিরছে ঘরপানে। সারা দেহে স্বেদবিন্দু। ঘন ঘন কম্পন। আড়ষ্ট পদসঞ্চার। অন্তরে বেদনার বিষাদ-সিন্ধু। কে যেন তার অধর-ইন্দুকে ঢেকে দিয়েছে অসিত বর্ণে। রক্তনেত্র। শিথিলবসন। উন্মাদপ্রায়।

তখনও আকাশ থেকে মুছে যায়নি জ্যোছ্নার রজত-প্রভা। কাটেনি রাত। নিদ্রাছন্ন পুরী। নিস্তব্ধ। নিঝুম।"[৫৫]

বস্তুত একটি শব্দ নিয়ে একটি বাক্য সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে লেখকের কাব্যময়তার আকর্ষণকে প্রাধান্য দেয়। সেই সঙ্গে গদাধরের সার্থক সাধনজীবনের চিত্রটিও পরিষ্কৃত হয়।

যেহেতু গ্রন্থের নাম 'মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ', সেইহেতু বুঝতে অসুবিধা হয়না লেখকের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ। তবে সাহিত্যের আঙিনায় লেখক যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন পরিবেশন করতে তৎপর হয়েছেন, তখন কেবল তথ্য সাজিয়ে গ্রন্থটিকে জীবনীগ্রন্থ করে তোলেন নি। বরং আপন মনের কল্পনা মিশিয়ে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে এনেছেন সাধারণ

মানুষের জীবনের মতো করে। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ নন—সব ক'টি চরিত্রই এসেছে রক্তমাংসের মানুষ হয়ে। যেমন রানি রাসমণি সম্পর্কে লেখকের বর্ণনা :

> "অবসন্ন রানির দেহ। চোখের জলে ভিজে গেছে বুক। তন্দ্রালু নয়ন। বসে আছেন। সামনে মথুরমোহন। আর আছে রানির দেওয়ান রামধন।"[৫৬]

কিংবা দক্ষিণেশ্বরের ভাঁড়ারীর কথা :

> "... ক্ষমা করলেন তিনি, ক্ষমা করলেন ভাঁড়ারীকে। চাকরি তার রইল। আশ্বস্ত হলো ভাঁড়ারী। আনন্দে ভরে গেল তার মন। করজোড়ে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করল বারে বারে। গদাধর ঠাকুরকে জানাল অন্তরের অকুণ্ঠ প্রণাম।"[৫৭]

গদাধর চরিত্রটিও সাধারণের জীবন অনুসারী হয়ে উঠেছে। আসলে গ্রন্থটি যেহেতু মানব থেকে মহামানব হয়ে মুক্তপুরুষের দিকে যাত্রা, তাই সন্তজীবনের আধার হয়েও এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ত হয়ে ওঠার প্রাক মুহূর্তটি ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে সাধারণ জীবনের সাধারণ চিত্র উপস্থাপনে কোনোরূপ বাধা থাকে না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ তথা গদাধর চরিত্রটি খুব সহজেই রক্তমাংসের হয়ে উঠতে পেরেছে। ভৈরবীর সঙ্গে কথোপকথন কিংবা শৈশবের গদাধর-জীবন এই বক্তব্যের সমর্থনে জোরালো প্রমাণ পেশ করে।

মৃণালকান্তি দাশগুপ্তের অন্য তিনটি রচনা যাতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছেন স্বাভাবিক চরিত্র হয়ে, সেগুলি হল- 'পরমারাধ্য শ্রীমা', 'যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ), এবং 'সবার মা সারদা' (১৩৭০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে। 'সবার মা সারদা'(১৩৭০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থও কাব্যলক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস। মা সারদা বিষয়ক জীবনীসাহিত্যে যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আসেন, এই গ্রন্থতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বলা চলে, এই গ্রন্থটি মা সারদাদেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। তাই যেরকম মা সারদার জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো স্বামী হয়ে, কখনো বা গুরু হয়ে, কখনোবা পূজক হয়ে আসেন, সেরকমই এখানেও তাঁর সেভাবেই আগমন। তাই নতুন করে বা অন্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখা যায় না এখানে। 'পরমারাধ্য শ্রীমা'-র ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তবে 'যুগবিপ্লবী বিবেকানন্দ' (১৩৬২ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমন বেশ কিছু ছত্রে। আসলে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেতিহাসেও দেখা যায়

তিনি গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে বিভিন্ন সময়ে মনে করেছেন। এমনকী, পাশ্চাত্যে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ও তাঁর গুরুদেব সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেক্ষেত্রে বিবেকানন্দের জীবনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রাসঙ্গিক। এই আগমন নরেনকে নরেন থেকে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হয়ে ওঠার প্রেরণা জোগায়। স্বাভাবিকভাবেই এই সব রচনাগুলিতে সেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো নতুন দিক উন্মোচিত হয়নি।

(৫)

চিত্রগুপ্ত ছদ্মনামে মনোমোহন ঘোষ একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— ‘গহরজান’(১৯৫৪), ‘কলুষিত প্রেম’, ‘আমি চঞ্চল হে’(১৩৬৭), ‘এরা অভিযুক্ত আসামী’, ‘চেনা মুখের মিছিল’, ‘জীবন বিচিত্রা’, ‘বরণীয় যাঁরা আদালতে’, ‘আদালতে বিপন্ন বিবেকানন্দ’, ‘গ্রীণরুম থেকে কোর্টরুম’ ইত্যাদি গ্রন্থ। আদালতের নথি ঘেঁটে তথ্য উদ্ধার করে তাকে সাহিত্যের রূপ দিয়ে প্রকাশ করেছেন লেখক। তাঁর সৃষ্ট রচনাগুলি পড়লে সহজেই তার প্রমাণ মেলে। সুতরাং সেদিক থেকে বিলুপ্ত চাঞ্চল্যকর তথ্যসহযোগে রোমাঞ্চকর বাতাবরণে সাহিত্যের পরিবেশন করে মনোমোহন ঘোষ চিত্রগুপ্ত ছদ্মনামে পরিচিতি লাভ করেন। তবে তাঁর রচনা ‘মুক্তপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) অন্যমাত্রিক পরিবেশন।

সমগ্র গ্রন্থের বিষয় গ্রহণ করা হয়েছে কথামৃত থেকে। বলাবাহুল্য, কথামৃতের গল্প ও ঘটনা লেখক নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। সেদিক থেকে গ্রন্থটি মৌলিক নয়। আবার গ্রন্থের উপস্থাপন রীতিটি সাহিত্যের মতো করে। অর্থাৎ কথামৃতের সাল তারিখ বাদ দিয়ে কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বকথা ও গল্পগুলিকে সংগ্রহ করে লেখক ছোট ছোট বাক্য দিয়ে অধ্যায় সাজিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই কোনো অধ্যায়ের সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো অধ্যায়ের সম্পর্ক সেভাবে ধরা পড়ে না। একটি ছোট্ট উদাহরণ দেখলেই বোঝা যায় লেখকের বলার ধরনটি :

“আসয় সংশয় থেকেই সংসারীর সন্দেহ তিনি কী আছেন?

"কিন্তু একদিনেই কি নাড়ী দেখা শেখা যায়? বৈদ্যের সঙ্গে অনেক ঘুরতে হয়। কোনটি কফের, কোনটা বায়ুর, কোনটা পিত্তের নাড়ী তখন বলতে পারা যায়। যাদের নাড়ী দেখা ব্যবসা তাদের সঙ্গে থাকতে হয়। তবে তো নাড়ীজ্ঞান হবে। সংসারী লোক স্ত্রীর দাস।

"জজ, ম্যাজিস্ট্রেট , উকিল, মোক্তার হয়ে বাইরে যত বোলবোলও হোক, স্ত্রীর কাছে কেঁচো। অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে অন্যায় হলেও সেটা রোধ করবার শক্তি নাই। ভালই হোক মন্দই হোক নিজের পরিবারকে সবাই সুখ্যাত করে।"[৫৮]

আবার কখনো কখনো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কাহিনি ছোট ছোট করে তুলে ধরেছেন। তবে সেক্ষেত্রে পরবর্তী বা পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাকে নিয়ে পরপর গল্প বলা হয়েছে। যেমন সারদা দেবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কের কথা গ্রন্থের প্রায় শেষে তুলে ধরেছেন। সেখানে যেমন সময়ের কোনো বেদ নেই, তেমনি ঘটনার কোনো যোগসূত্র নেই। যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদাকে প্রশ্ন করছেন ক'টাকা হলে তাঁর চলবে। মা লজ্জা পাচ্ছেন। এই ঘটনার সঙ্গেই লেখক লিখলেন :

"শুয়ে আছেন ঠাকুর।

দরজা খুলে কে যেন ভিতরে এলেন।

ঠাকুর ভাবলেন, লক্ষ্মী।

বললেন, যাবার সময় দরজা ভেজিয়ে যাস।"[৫৯]

ঠিক একই সঙ্গে লেখক আবার যুক্ত করলেন :

"ঠাকুর রাগ করেছেন শুনে শ্রীমা কেঁদে ফেললেন। চলে এলেন কলকাতায়।....."[৬০]

ফলে গ্রন্থটি একদিকে যেমন এক সূত্রে গ্রথিত হয়নি, তেমনি সাহিত্য-স্বংরূপেও দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। যেকারণে এটি সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। আবার জীবনী সাহিত্যের কাঠামোতেও তাকে ফেলা যায় না। অথচ কথাসাহিত্যের আদলটির অমার্জিত রূপ ধরা পড়ে। রচনায় পুজ্য ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মার্গদর্শনের চিত্রটি অপরূপ চিত্রিত হয়েছে।

(৬)

জীবনীকার মণি বাগচি অনেকগুলি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘রবির আলো’, ‘সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী’, ‘দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র’, ‘নিবেদিতা’, ‘সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ’, ‘মাইকেল’, ‘পরমা প্রকৃতি সারদা’, ‘নানাসাহেব’, ‘যুগমানব অরবিন্দ’, ‘যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ’, ‘রামমোহন’, ‘শরৎচন্দ্র’, ‘বিদ্যাসাগর’ প্রভৃতি। গ্রন্থগুলি সবই কিশোর সাহিত্য এবং জীবনী গ্রন্থ। তবে ‘যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৩৬৩) কিশোরদের হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণে দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। সেদিক থেকে কিশোর মনেও এই ভাব সঞ্চরণে গ্রন্থের ভূমিকা অনবদ্য। তবে কথাসাহিত্যের পর্যায়ে এই রচনা সেভাবে পড়ে না। কারণ ঘটনার ঘনঘটা নেই, আছে প্রচলিত জীবনী গ্রন্থগুলিকে অবলম্বন করে কথার মতো করে কিশোরদের জন্য বলা কাহিনি। তাই একদিক দিয়ে যেমন এর সরলতা ও সহজতা কথাসাহিত্যের আঙিনায় দোলা দেয়, তেমনই মধ্যবিত্ত জনমানসে বিপুলভাবে প্রচারিত ও ভগবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের উজ্জ্বল অবস্থান প্রমাণ করে।

অপর একজন সাহিত্যিক মণি গঙ্গোপাধ্যায়ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে তা একটু ভিন্ন মোড়কে। গ্রন্থের নাম ‘ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৯৬০)। গ্রন্থের সূচনাতে ‘গ্রন্থম্’ প্রকাশনীর তরফে বলা হয় :

> “আজও তেমনই ক’রে প্রকাশ করেছে একটি নতুন ভংগীতে লেখা অপূর্ব জীবন-কাব্য। লেখক উদীয়মান হ’লেও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন এবং একনিষ্ঠ।”[৬১]

গ্রন্থটির সূচনা হয়েছে এইভাবে :

> “কল্যাণীয় রণ্টু,
>
> তোমার সেদিনকার প্রশ্নটা আমি ভুলিনি। বিদেশ যাবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলাম তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিনি। এখানে এসে প্রথম তোমাকে চিঠি লিখতে ব’সেছি।

"তুমি জানতে চেয়েছিলে—মানব জন্মের উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নের বোধহয় একটিমাত্র উত্তর আছে। আর সেই উত্তর দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।"[৬২]

বস্তুত, সূচনা থেকেই বোঝা যায় এটি পত্রাকারে লেখা। পত্রপ্রাপক কিশোর। গ্রন্থের উৎসর্গও করা হয়েছে মণ্টু, রণ্টু ভুটু, বাপীকে। বলাবাহুল্য, বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই রচনা কিশোরদের উপযোগী করে পত্রাকারে লেখা সাহিত্য। স্বাভাবিকভাবেই এর ভাষা যেমন কথ্যরীতির, তেমনই পত্রসাহিত্যের আঙ্গিকে মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে। আর একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে :

"তুমি জান, অমৃত উঠেছিল সমুদ্র মন্থনের ফলে। সুতরাং এমন কথামৃত, একটি নয় শতশত কথামৃত যাঁর মুখ দিয়ে মুক্তার মত ঝ'রে পড়েছে তাঁর জীবনও সমুদ্রের মত গভীর, রহস্যময় আর সম্পদের আকর। এত বিরাট জীবনকে জানতে গেলে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয়। এখন থেকে তুমি যদি একটু একটু ক'রে প্রস্তুত হও তা হ'লে ভবিষ্যতে এই মহাপুরুষকে নিশ্চয়ই চিন্‌তে পারবে, পারবে তাঁর কথামৃতের মর্মোদ্ধার করতে।"[৬৩]

ফলে বোঝা যায়, লেখক পত্রের আকারে শিশু কিশোরদের মতো করে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। তবে তা বাস্তবসম্মতভাবে। সেখানে যেমন কোনো অলৌকিকতার প্রাধান্য নেই, তেমনই যুক্তিনির্ভর গ্রন্থ রচনায় সফলকাম হয়েছেন লেখক। আবার এর ভাষা ও ভঙ্গিমা লক্ষ করলে দেখা যায় সার্থক সাহিত্যের ছত্রছায়ায় রচিত। যেমন :

"রাণী রাসমণির অনুরোধে রামকুমার মন্দিরে প্রত্যহ পূজার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন। ফলে সেখানেই থাকতে হ'য়েছিল তাঁকে। গদাধর কি আর করে! দাদার কাছ থেকে দূরে একা একা কতদিন থাকা যায়? বাধ্য হ'য়ে দক্ষিণেশ্বরে এসে বসবাস শুরু হ'ল তার। কিন্তু আহারের ব্যাপারে নিজের সংকল্প দৃঢ় রইলেন তরুণ ব্রহ্মচারী।"[৬৪]

পত্রোপন্যাসের শেষ পত্র তথা শেষ অধ্যায়ে লেখক আবার ফিরে গেছেন প্রথম অধ্যায়ের প্রসঙ্গে। যে কথামৃত দিয়ে চিঠি শুরু হয়েছিল তা দিয়েই শেষ হয়েছে এই গ্রন্থ। কথামৃত থেকে বেশ কিছু বাণী উদ্ধৃত করে সাহিত্যিক এই গ্রন্থের ইতি টানেন। বস্তুত, পত্রের আঙ্গিকে উপন্যাসের এই ধরনটি কেবল কিশোর নয়, আপামর পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর প্রধান কারণ কেবল সাহিত্যের আঙ্গিকটি নয়, বরং শ্রীরামকৃষ্ণের মানব থেকে মানবোত্তরে পৌঁছানোর প্রতিটি সোপানের যুক্তিসহ বিশ্লেষণ ও তা কথ্যভাষায় পরিবেশন পাঠককে মুগ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেবল অধ্যাত্ম

জগতের পুরোধাই নন—তিনিও যে সমানভাবে শিশু-কিশোরদেরও মহান আদর্শ হতে পারেন, তার সার্থক পরিস্ফূটন ঘটেছে এই গ্রন্থে।

প্রায় একই সময়ে অপর একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায় নন্দলাল ভট্টাচার্যের 'শতাব্দীর কল্পতরু' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি ভক্তদের কাছে কল্পতরু হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের এই শেষপর্বকে কেন্দ্র করে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। সূচনা অংশে লেখক জানিয়েছেন :

> "সেই পর্বের অন্যতম লীলা তাঁর ওই কল্পতরু রূপের প্রকাশ। সেটিই আমাদের উপজীব্য। কিন্তু প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে বলরামভবন, শ্যামপুকুরবাটী এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীর কথা। মূলত কথামৃত, শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ আর লীলামৃত-র অনুসরণে—এ শুধু ফিরে লেখা।"[৬৫]

ঠাকুরের অন্ত্যলীলাকে কেন্দ্র করে লেখা এই উপন্যাসটি ধর্মীয় জগতের অধ্যাত্ম পুরুষ অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রকাশ করে। উপন্যাসের শুরুতেই আছে :

> "যুগত্রাতা যিনি—যুগের প্রয়োজনেই যাঁর আবির্ভাব—ভক্তের ক্রন্দনে-আকুলতায়—সেই অবতারবরিষ্ঠ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ধন্য—বিলাসের ভূমি—মন্দির পরিণত হয়ে হ'ল সাধনার ক্ষেত্র।"[৬৬]

আবার ইতিহাসের জবানবন্দীতে তথ্য সংগ্রহ করে আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে লেখক উপন্যাসোচিত বক্তব্য ও সংলাপ রচনা করেছেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলালের সঙ্গে কথোপকথনে তার প্রতিফলন সহজে ধরা পড়ে :

> "আচ্ছা, এই যে তোমার ঠাকুর—পরমহংস—এঁর চিকিৎসা—থাকা খাওয়া খরচ চলছে কী করে? চিকিৎসা করতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার সরকার।
>
> কেন? আমরাই দিচ্ছি। যার যা সাধ্য সেইমত চাঁদা দিচ্ছি আমরা—তাতেই হচ্ছে সব—হয়ে যাচ্ছে।
>
> ও। একটু যেন গম্ভীর হলেন ডাক্তার সরকার। সবাই ভাবেন—কি জানি ঠিকমত ফিজ্ পাবেন কিনা সেকথাই হয়ত ভাবছেন ডাক্তার।"[৬৭]

বলাবাহুল্য, কী অসাধারণ বাক্‌ভঙ্গিমায় লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের অন্ত্যলীলাকে উপজীব্য করে শ্রীরামকৃষ্ণসহ সংশ্লিষ্ট সকল চরিত্রকে নিখুঁত চিত্রিত করেছেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের সংলাপেও ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

তবে তাঁকে অবতার জেনেও মহামানবের সীমানায় বাঁধতে চেয়েছেন লেখক। যেকারণে শেষপর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ভক্তবৃন্দের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে কথামৃতের সকল কথাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বরং ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিনযাপনের জীবনপঞ্জিই বেশি আলোকিত হয়েছে এই গ্রন্থে। সেদিক থেকে গ্রন্থটি উপন্যাস হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণও মানবের মাঝে মুক্তপুরুষ হয়ে জ্ঞান বিতরণে রত থেকেছেন।

অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লেখা 'জনক-জননী' নামে একটি নকশাধর্মী রচনা পাওয়া যায়। উপন্যাস একারণেই বলা যাচ্ছে না, এর গল্প বলার ধরনটি অতি সংক্ষিপ্ত। এখানে জনক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং জননী হলেন শ্রীমাসারদা দেবী। জনক অংশে একটি রেখাচিত্র ধরা যেতে পারে :

> "মথুরবাবু এসে ধরে বসলেন, এবার থেকে মা ভব-তারিণীর পুজো আপনাকেই করতে হবে!
>
> রামকৃষ্ণ বলেন, কেমন করে পুজো করতে হয়, তা তো আমি জানি না এখনো!
>
> মথুরবাবু বলেন, আমরা তা জানি না। আপনার যেমন ভাবে পুজো করতে ইচ্ছে যায়, তেমনই ভাবেই করবেন।
>
> রামকৃষ্ণ রাজী হন ... ..."[৬৮]

বস্তুত এ জাতীয় সংলাপ ও বর্ণনা উপন্যাসের লক্ষ্মণকে ধরতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই তা অনেক তরল হয়ে পড়ে।

গ্রন্থকার গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ নামকরণের কারণ লিখেছেন :

> "এই পুস্তকের নাম রাখিয়াছি 'জনক-জননী'। জনক, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও জননী, দেবী সারদামণি ... এই পুস্তক হইল তাঁহাদের দুইজনের জীবন-কাহিনী।"[৬৯]

তবে কাহিনির গঠনে যেমন দুর্বলতা তেমনই বিষয়েও অগভীরতা লক্ষ করা যায়। ছোট ছোট বাষট্টিটি অধ্যায়ে 'জনক' অংশটি সমাপ্ত হয়েছে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের সর্বজীবের পিতাস্বরূপ। তাঁর আবির্ভাব যুগের প্রয়োজনে। বিশেষত শিবজ্ঞানে জীবসেবার বিষয়টি অন্যতম শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে প্রচারপূর্বক এক চেতনার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তিনি। তার জন্যই তাঁর এই ভবে আসা। এই বিষয়টিই বেশি আলোকিত হয়েছে। অংশটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারও উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় অংশ 'জননী' সম্পূর্ণ হয়েছে আটত্রিশটি অধ্যায়ে। পরমহংসদেবের দেহরক্ষার পরের পর্যায় থেকে অংশটি শুরু হলেও কিছু পরেই ঠাকুরের জীবৎকালের গল্প এসে ধরা পড়ে। তবে সমগ্র অংশটিতে জননী সারদার জীবনকাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে।

(৭)

বর্তমানকালের একজন প্রথিতযশা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যিক হলেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬—)। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করে চলেছেন। তাঁর এই বিষয়ে রচিত প্রত্যক্ষ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৪১৬ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র' (২০০০), 'গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০০০), 'মা সারদার পালকি' (২০১৪), 'দেবভূমি কামারপুকুর' (২০১৪), 'পায়ে পায়ে পথচলা' (২০১৪), 'ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৯৯৯), 'কালের কাণ্ডারী' (২০০২), 'দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১১), 'সোনার ধুলো' (২০০৭), 'ধর্মযুদ্ধ' (২০১১), 'গঙ্গাবক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১২), 'অশেষ' (২০০৬) ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, গ্রন্থগুলি প্রায় সবকটিই হাল আমলের রচনা। লেখক বর্তমান সময়ে এই জাতীয় রচনা লিখে চলেছেন।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি বৃহৎ জীবনীমূলক উপন্যাস হল 'রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ' (১৪১৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি জানিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণটি। লেখক লিখেছেন :

> "যুগ প্রয়োজনে বারে বারে তাঁরা এসেছেন। ... অবশেষে এলেন তিনি। নীরবে নিভৃতে। ... বিশেষ কোনো ঘোষণা নেই। সাজ নেই। অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস নেই। নিতান্তই একজন। তাঁর অপ্রকাশটাই প্রকাশ। যেমন বসন্ত আসে সবুজপাতায়, বর্ষা আসে কালো মেঘে।"[৭০]

ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি অবতাররূপে। তবে তাঁর বাল্যকালের ঘটনাবলিকে একপ্রকার বাদ দিয়ে তাঁর কলকাতার জীবনকে অঙ্কন করেছেন এই গ্রন্থে। গ্রহণ করেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের গল্প ও ঘটনা। কথামৃতে যে সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশাদি ব্যক্ত করেছেন, তার চেয়েও আরও সহজ হয় কিনা তা জানা নেই। তবে লেখক হয়তো সে চেষ্টাও করেছেন। না হলে কথামৃতের কথাকে এভাবে ভেঙে ভেঙে বলতে যাবেনই বা কেন। ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে সংসারে থাকার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে উদ্ধৃতি না করে লিখেছেন :

> "একথা বলেই বলছেন, জলে অনেক হাঙর, কুমীর, মকর আছে। নামলেই তারা গ্রাস করবে তোমাকে। উপায়টা কি? উপায় হচ্ছে, হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে ওঁরা কিছু করতে পারবে না। সে হলুদ তুমি পাবে কোথায়? সংসারের জলে যে এত নক্র মকরাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জন্য তুমি কোন্ হলুদ মাখবে? কুকমী বা ডাটার গুঁড়ো মশলার হলুদ? না। বিবেক হলুদ। বিবেক হলুদ গায়ে মেখে নামো।"[৭১]

বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এত কথা বলেননি। এক লাইনেই মূল ভাবটি অতি সহজ করে বুঝিয়েছেন শিষ্যদের। কিন্তু লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তার ভাব সম্প্রসারণ করেছেন।

লেখক অধ্যায় ভাগ করেছেন। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতা মেনে নয়। যেমন পঞ্চম অধ্যায়ে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপচারিতা রয়েছে। পরের অধ্যায়ে শ্রীম'র সঙ্গে সাক্ষাৎ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, দত্তবাড়ির ইতিহাস ইত্যাদি। সেইসঙ্গে হঠাৎ করে শুরু হয়েছে কয়েকজন শিষ্যের পরিচয় জ্ঞাপন। দশম অধ্যায়ে রয়েছে কলকাতার কালীপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের কালীপূজার বর্ণনা। পরের অধ্যায়গুলির মূল বিষয় যদি সাজানো হয়, তাহলে এইরূপ হতে পারে— ১১) মন ও আত্মা তথা ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা, ১২) কালীতত্ত্ব, ১৩) রামপ্রসাদের জীবনী, ১৪)

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার্চনা, ১৫) সন্ন্যাসী ও গৃহী, ১৬) কাশী ভ্রমণের পথে, ১৭) কাশীতে, ১৮) বারাণসীতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, ১৯) প্রভুদয়াল মিশ্র, ২০) রোগগ্রস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ (১৮৮৫) কয়েকটি দিনের বর্ণনা কথামৃত অনুসারে, ২১) পরোপকার জীবন ভাবনা, ২২) পুরীর জগন্নাথ ও মন্দির বৃত্তান্ত, ২৩) মা সারদার প্রয়োজন কেন?, ২৪) শক্তিরূপিনী মা সারদা, ২৫) ঈশ্বরতত্ত্ব, ২৬) বিদ্যাসাগর-শ্রীরামকৃষ্ণ, ২৭) জীবনের লক্ষ্য, ২৮) নরেন্দ্রনাথের জীবন, ২৯) ব্রহ্ম ও মায়া, কল্পতরু দিবস, ৩০) বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে ভাবপ্রচার, ৩১) কথামৃত-র ইতিহাস, ৩২) কালীতত্ত্ব, ৩৩) শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কাল্পনিক সংলাপ, ৩৪) শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত, ৩৫) সংক্ষেপে দক্ষিণেশ্বর জীবন, ৩৬) জ্যান্ত দুর্গা শ্রীমা, ৩৭) নরেনের শ্রীরামকৃষ্ণ।

বস্তুত সমগ্র গ্রন্থটিতে ঘটনার কোনো ধারাবাহিকতা নেই। লেখক সেই পথে যেতেও চাননি। কিন্তু তিনি যা চেয়েছেন, বর্তমান সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তার গুরুত্ব কতখানি—তার সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটানো। বর্তমান সময়ে একজন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন চিত্র বর্ণনা করেছেন :

> "কি দরকার? বেশ তো আছি। একটা চাকরি জুটে গেছে। রোজগার নেহাত খারাপ নয়। সংসার-টংসার হয়েছে। পুত্র-পরিবার নিয়ে বেশ তো আছি। আর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা ভোগ্যবস্তু দানে অকৃপণ! ... কতরকমের ইজ্‌ম—মার্কসিজম, টেররিজম! তবু কেন হেরি তব বিষণ্ণ বদন! প্রাণখোলা হাসি কই! কোথায় সেই ভালোবাসা! কোথায় মানুষে মানুষে সেই মধুর সম্পর্ক!"[৭২]

তারপরেই জানিয়েছেন, কোথাও কিছু নেই। এই সংসার করা কেবল নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য। শুধু কষ্টের জীবনের বর্ণনা দিলেন না, সেইসঙ্গে সেখান থেকে উত্তরণের পথটিও বলে দিলেন। বললেন শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণ করতে। কেমন করে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করতে হবে তাও তিনি জানিয়ে দিলেন। কথামৃত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আছে—এতেই কেবল দেশ উদ্ধার হবে না, কিংবা নিজের উন্নতি হবে না, প্রয়োজন তাঁর বাণী, তাঁর আদেশকে শিরোধার্য করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। সব রত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মোন্নতির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ রত্ন ধারণ করতে হবে। কারণ তিনি রত্নাকর। তাই গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ'। আসলে সঞ্জীব বর্তমান সমাজব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত জনগণের যুগযন্ত্রণা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অবিরাম ক্ষত-বিক্ষত জটিল জীবন যাপনের ভয়ংকর রূপটি লক্ষ করেছেন। আর তা থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা সত্য, ভালোবাসা—যার ঘনীভূত রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁকেই অনুসরণ করতে বললেন ও মনে-প্রাণে তাঁর বাণী গ্রহণ

করার বিধান দিলেন। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে উঠেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের পরমপুরুষ, সাংসারিক দোলাচলতা সমাধানে একমাত্র রত্নবস্তু। একইসঙ্গে গ্রন্থটিও ভরে উঠেছে সামগ্রিক সাহিত্যরসে।

সঞ্জীবের অপর দুই বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র' (২০০০) ও 'গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ' (সংস্করণ ২০০০) দুটি উপন্যাসের বিষয় প্রায় এক হলেও দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। উপন্যাসদুটি এক মলাটে দে'জ পাবলিশিং থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য গিরিশচন্দ্র' (২০১৪) নামে প্রকাশ পায়।

'শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশচন্দ্র' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গিরিশচন্দ্র। স্বভাবতই গিরিশচন্দ্র চরিত্রটির প্রতি লেখকের অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকা স্বাভাবিক। অন্যরকম অর্থে অনেক বেশি সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলা। সেদিক থেকে কিছু ভ্রান্তি হয়নি। পঞ্চম অধ্যায়ে একটি দৃশ্যে দেখা যায় :

> "দুপুর গড়িয়ে এই বিকেল হয় আর কি! শরতের বেলা। সূর্য দ্রুত গতিতে পশ্চিমে ডুবে যেতে পারলেই যেন বাঁচেন। গিরিশচন্দ্র আহারাদির পর বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। কপালের ওপর একটি হাত ফেলে রেখেছেন, শিথিল। কখনও সামান্য তন্দ্রা, কখনো ভাবনা। চৈতন্যলীলার পর স্টারে পরবর্তী নাটক প্রহ্লাদ চরিত্র। ..."[৭৩]

বলাবাহুল্য গিরিশচন্দ্রকে লেখক যেভাবে অঙ্কিত করেছেন তা কোনোমতেই ইতিহাসের গিরিশকে মনে হয় না। মনে হয় যেন বাস্তবের মাটিতে ঘটে চলা একটি ঘটনার চরিত্র নাট্যকার গিরিশ ঘোষ। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রটিও অনেক বেশি বাস্তব মনে হয়েছে। কারণ গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কথোপকথনের সূত্র ধরেই নয়, বরং গিরিশ ঘোষ ও শ্রীরামকৃষ্ণের কালপর্বের বিভিন্ন ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের সূত্র ধরে ক্রম প্রকাশিত হয়েছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রটিও একটি কালপর্বে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত হয়েছে এই উপন্যাসে।

তবে উপন্যাসের একটি চরিত্র কাল্পনিক বলে বোধ হয়। চরিত্রটি শিশু মানিকের। 'চৈতন্যলীলা' দেখতে যাওয়ার পথে মহেন্দ্রবাবু ময়দার কলের গদিতে সামান্য বিশ্রাম নিতে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেখানে ঠাকুর বাহ্যে যেতে চাইলে মানিক গাড়ু ভরে জল নিয়ে আসে। সেই মানিক তামাক সেজে দেয় এবং পান নিয়ে ঠাকুরের গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে। পরে আর একটি দৃশ্যে দেখা যায় সে গিরিশের সঙ্গে গল্পে মশগুল। একসময় পথশিশু মানিকের মৃত্যু হচ্ছে। মৃত্যু সম্পর্কে মানিকের সেই সংলাপ :

"আমি মন্দিরে মাকে গিয়ে বললুম, মা, আমাকে মেরে ফেল।'

'এই অল্প বয়সে মরতে চাইছিস কেন?'

'ভালো করে জন্মাব বলে।'"[৭৪]

একটি অশালীন অভদ্র চরিত্র কিভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হচ্ছে তারই বর্ণনা এই উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এতে কল্পনার আশ্রয় খুব বেশি নেই বা করা যাবে না ইতিহাস বিকৃত হবে বলে, তাই লেখক খুব সন্তর্পণে গিরিশ চরিত্রটিকে সবদিক দিয়ে সঠিক রেখেও রক্তমাংসের তৈরি করতে পেরেছেন। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা চরিত্র গঠনের শিক্ষক হিসেবে। তবে সরাসরি নয়, গিরিশের ভেতরের আলোটিকে দেখিয়ে আপন চরিত্রবলে সমূহ উন্নতির সোপানে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছেন মাত্র। দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটি শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহস্পর্শে গিরিশচন্দ্র হয়ে উঠেছেন আলোকিত ব্যক্তিত্ব। তাই ঠাকুরের সমাধিতে চলে যাওয়ার সময়ে যেন তিনি গিরিশের বিষয়ে দৈববাণী করেছেন। উপন্যাস শেষ হয়েছে ঠাকুরের ভবিষ্যৎবাণী দিয়ে :

"'গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিসনে, তোকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে।'

"বিমুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ দেখছেন। সমাধি থেকে নেমে এসে পরমকরুণাময় গিরিশের হাত ধরেছেন, 'চল্ দক্ষিণেশ্বরে।'

"নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের পদধূলি নিয়ে বললেন, 'জি.সি., তুমিই ধন্য!'"[৭৫]

অপর একটি উপন্যাস 'গিরিশচন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০০০)। এই উপন্যাসটির বিষয়ও প্রায় একই। তবে এর গঠন একটু অন্যরকম। প্রতিটি পরিচ্ছেদ সংখ্যাসূচক নয়, নাম রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম—'পোহাল যামিনী, বহে ধীর সমীরণ'। রাতের অন্ধকারে নৌকায় মদ খেতে খেতে সঙ্গী কালীপদ ঘোষকে নিয়ে গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে কালীপদর নবজীবন লাভ এই অংশের মূল বিষয়। যে কালীপদর জন্য তাঁর স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে মদ্যপ স্বামীর মদ ছাড়ার উপায় চাইতেন, সেই কালীপদকে প্রথমবার দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক উপায়ে বলে

গেলেন, 'বৌটাকে বারো বছর ভুগিয়ে তবে এখানে এলি।'[৭৬] এই চমৎকারিত্বে কালীপদ হতভম্ব ও তাঁর শরণাগত হয়েছেন। তবে গিরিশচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগত প্রাণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে'। অশ্বিনীকুমার দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন—সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপস্থিত। বাকি কেবল নরেন্দ্রনাথ আর শিবনাথ। লাটুর সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণ জানিয়েছেন ভাগ্নে হৃদয়ের চারিত্রিক অবনতির কথা ও দক্ষিণেশ্বর থেকে বিতারিত হওয়ার ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য জিলিপি আনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামচন্দ্র দত্ত যে স্বীকার করেছেন, 'আজ একেবারে পাকাপাকি বুঝে গেলুম, ইনি অবতার'।[৭৭]

তৃতীয় অধ্যায়—'না রাখিব মহাদেব নাম—অ্যাঁ এ কি লিখলে গিরিশ!' 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে দক্ষরাজরূপী গিরিশ ঘোষের সংলাপ এটি। ঠাকুর তা দেখে শিউরে উঠলেন। ঠাকুর বললেন, 'এসব কি লিখেছ—শিব নাম আর না রাখিব ধরায়—এসব কি লিখতে আছে!'[৭৮] গিরিশ অপরাধীর মতো উত্তর দেন, 'কি করব! পেটের দায়ে সব করতে হয়। কি করব। দর্শক আর অভিনেতা। পালা আর পয়সা!'[৭৯] ঠাকুর এবার প্রত্যুত্তরে গিরিশের নাট্যপ্রতিভাকে তুলে ধরার অবকাশ বলে দিলেন, 'তোমার লক্ষ্য হবে বিশ্বাস, আমাদের হিন্দু ধর্মের অভিজাত সংস্কার। বিশ্বাসের খুঁটি কখনো নড়াবে না।'[৮০] এইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে লাটুর সঙ্গে কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনার চিত্র, তোতাপুরী ও ভৈরবীর কথা প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

চতুর্থ অধ্যায়—'আমার জাত গিয়েছে।' এই অধ্যায়ে দেখা যায় গিরিশ ক্রমশ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসাগরে ডুবে যাচ্ছেন। স্ত্রী সুরতকুমারীকে তাই বলেছেন, 'আমার জাত গিয়েছে।' ভাই অতুলচন্দ্রকে দৃঢ়স্বরে জানিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। এরপরের ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব। সময় ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫। এখানে লেখক কথামৃত থেকে হুবহু নকল করেছেন। কয়েকটি সংলাপে সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন—কথামৃতে আছে, 'ফচকিমিতেও আপনাকে পারলুম না।' উপন্যাসে লেখক প্রয়োজনবোধে লিখেছেন, 'আহা। ফচকিমিতে আপনাকে পারলুম কই।'[৮১] কয়েকটি সংলাপ কথামৃত অনুসরণে বানানো। যেমন :

> "মাস্টারমশাই বললেন, 'ঠিক এই কথাটিই বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।' ঠাকুর বললেন, 'এই দেখো, ও পড়েছে আমি পড়িনি অথচ দুজনের মাথা ঠোকাঠুকি।'"[৮২]

শেষ অংশে মা সারদার সঙ্গে কথোপকথনেও ঠাকুরের অবতারত্বকে স্বীকার করা হয়েছে : "মা বললেন, 'তুমি কি আমার?' 'আমি তাহলে কার?' 'তুমি জগতের।'"[৮৩]

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'সাধুসঙ্গের নামে আছে পান্থধাম'। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ''বৃষকেতু' নাটক দেখতে যাবেন। তার আগে গিরিশ ঘোষের বাড়িতে। নানান প্রশ্নের মধ্য দিয়ে গিরিশ খুঁজে পেতে চেয়েছেন আপন জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর। অবশেষে গিরিশকে দায়িত্ব দিচ্ছেন গৃহী ভক্তদের নেতৃত্ব দিতে। উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদ : "গিরিশচন্দ্র সেই সুউচ্চ মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করছেন। পাচ্ছেন না। ঠাকুর একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ধরো। শক্ত করে ধরো।'"[৮৪]

বস্তুত এই উপন্যাসটিতে গিরিশচন্দ্রের গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আপন শিষ্যকে সহজ হয়ে ধরা দিয়েছেন। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন পরমপুরুষ হয়ে, অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেন সেই পরমপুরুষের চরণাশ্রিত ভক্ত। স্বাভাবিকভাবেই গিরিশ ঘোষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কারণেই। উপন্যাসে তাই গিরিশচন্দ্র এসেছেন সহজ সরল মানুষ হয়ে। গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর হৃদয়ে উঠে এসেছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছেন সেই গুরুদেবের কথাতেই। তাই গিরিশ চরিত্রটির সার্থক উত্তরণের চিত্র এই উপন্যাসের একটি অন্যতম পর্যায়।

দে'জ থেকে প্রকাশিত 'মা সারদার পালকি' (২০১৪) ত্রয়ী উপন্যাসের সমষ্টি। গ্রন্থের প্রথম উপন্যাস 'মা সারদার পালকি'। উপন্যাসটির নামকরণ দেখে সহজেই বোঝা যায় সারদামায়ের জীবন অবলম্বনে রচিত। কিন্তু বিষয়টি তা না হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও কামারপুকুরসহ বঙ্গের ইতিহাস চিত্রিত হয়েছে। প্রথমে লেখক হয়তো সমগ্র উপন্যাসটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করতে চেয়েছিলেন। সেইমতো প্রথম পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন 'লক্ষ্মী এলেন গ্রামে'। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসটিতে আর কোনো নাম বা পরিচ্ছেদ বিভাজন দেখা যায় না। এর কারণ পাঠকের কাছে অজানা।

উপন্যাসের প্রথমে বঙ্গের ইতিহাস ফুটে উঠেছে। এসেছে মার্কোপোলো ও ফরাসী রেনলের ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা। মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন ও শ্রীনিবাসের ভূমিকা গল্পের মতো উঠে এসেছে। এসেছে বিষ্ণুপুরের মদন মোহনের গল্প। এরপর হঠাৎ করে শুরু হয়েছে জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র ও

শ্যামাসুন্দরীর কাহিনি। সারদা মায়ের জন্ম ও নামকরণ এবং ছোট্ট সারদার গল্প শুনতে শুনতে বাবার কোলে ঘুমিয়ে পড়ার গল্প দিয়ে সারদামণির জীবনকাহিনি এই উপন্যাসের শেষ। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের পরিচয় দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকাহিনি শুরু। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি দেবীর অলৌকিক স্বপ্নদর্শন, গদাধরের জন্ম, অন্নপ্রাশন, পড়াশুনা ইত্যাদির পর হঠাৎ করে ইতিহাস শুরু করেছেন ঔপন্যাসিক। কলকাতার ইতিহাসের সূত্র ধরে পৌঁছে গেছেন ভারতের সুলতানি শাসনকাল, জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী, আকবরের শাসনকাল, বাবরের আত্মজীবনী, সনাতন গোস্বামীর কাহিনি, ভাস্কো-ডা-গামাসহ বিভিন্ন পর্যটকদের আগমন, শের খাঁ, টমাস রো ইত্যাদি বিষয় হঠাৎ হঠাৎ উত্থাপন করেছেন লেখক। ইতিহাসের ক্রমন্বয়ে নয়, বরং যখন যা মনে হয়েছে তা-ই লিখেছেন। এরপর হঠাৎ করে ইতিহাস বন্ধ করে বালক গদাধরের গল্প লিখেছেন। চিনু শাঁখারির গল্প, পণ্ডিতদের বিতর্কসভায় গদাধর, ক্ষুদিরামের মৃত্যু ইত্যাদি জীবনের কাহিনিগুলো বলার পর আবার ইতিহাস রচনা করেছেন। এবার ধর্মের ইতিহাস, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ, ধর্মান্তরীকরণ। এরপর আবার গদাধরের জীবনে প্রবেশ। গদাধরের উপনয়ন। তারপর কলকাতার ইতিহাস। শুরু হয়েছে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিস্তৃত বর্ণনার পর সোজা ১৮৮১-১৮৮২ সালে পৌঁছে যান। তখন গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে কলকাতার বুকে বিরাজমান।

এবার সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মীয় সংস্কারকদের নাম উল্লেখ করে হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধনের রূপটি তুলে ধরলেন। এপ্রসঙ্গে ১৮৭৬ সালে কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব উঠে এসেছে। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের গল্প, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের কথোপকথন। একেবারে শেষ পর্যায়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধের বেশ কিছুটা অংশ তুলে একজন ব্রাহ্মের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়েছেন। সবশেষে একটি চিত্রপটে এঁকেছেন দানাদের ঘর, বলরাম বসুর গৃহ, বেলুড় মঠ, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি ও উদ্বোধনের চিত্র।

লক্ষ করা যায়, উপন্যাসটির গঠনরীতি বেশ দুর্বল। হঠাৎ হঠাৎ যেভাবে বিষয় পরিবর্তন করেছেন বা উপন্যাসের নামের সঙ্গে যেভাবে বিষয়ের অমিল পাওয়া যায় তাতে উপন্যাসটি বেশ দুর্বল বলেই মনে হয়। মা সারদার চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাধান্যই এতে বেশি এবং তার চেয়েও বেশি রয়েছে কলকাতাসহ বঙ্গের ইতিহাস। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিষ্ঠা ধর্মীয় সংস্কারকরূপে। তবে

ঔপন্যাসিক তাঁর গ্রন্থে মধ্যবিত্ত জনমানসে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকাকে চিত্রিত করলেন একান্তই বাস্তবসম্মতভাবে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি বাস্তবোচিত হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় উপন্যাস 'দেবভূমি কামারপুকুর' (২০১৪)। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে দামোদর ও আমোদর নদের উৎপত্তির বিবরণ দিয়ে। তারপর বঙ্গদেশের ইতিহাস, বিশেষত বিষ্ণুপুর-মান্দারনের ইতিহাস। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস থেকে অনেকখানি অংশ তুলে দিয়ে এই ইতিহাসকে লেখক তথ্যে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমির দিকে লক্ষ রেখে সে ইতিহাস ক্রমশ বিন্দুর দিকে ধাবিত হয়েছে। এরপর বদনগঞ্জের ইতিহাস, জমিদার রামানন্দ রায় ও ক্ষুদিরামের গল্প। অবশেষে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে গমন। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে কামারপুকুর নামের ব্যঞ্জনার ইতিহাসটি।

এরপরের ইতিহাসটি প্রায় সব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতেই পাওয়া যায়। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রামণির দেখা স্বপ্ন, চন্দ্রামণির অলৌকিক লক্ষ্মী দর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম, বাল্যলীলা, পড়াশুনা, বাল্যবন্ধু ও প্রতিবেশীদের পরিচয়, গদাধরের প্রথম সমাধি, ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে গদাধরের গোপন শোক, উপনয়ন, তর্কসভায় জিত ইত্যাদি কাহিনিগুলোকে রসময় করে বর্ণনা করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে দাদা রামকুমারের সঙ্গে গদাধরের কলকাতা গমনের মধ্য দিয়ে।

লেখক কামারপুকুরকে দেবস্থানরূপে তুলে ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মের পূর্বে কামারপুকুর কেমন ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মের পর তাঁর বাল্যলীলাকালে কামারপুকুর কেমন সেই চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে লেখকের উদ্দেশ্য—কামারপুকুর যে দেবভূমি, তা পাঠকসমক্ষে চিত্রিত করা। তাই যুক্তি ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কামারপুকুর হয়ে উঠেছে জীবন্তভূমি।

উপন্যাসটি আসলে গদাধরের জীবন-কাহিনি। স্বামী সারদানন্দের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ' এই উপন্যাসটি রচনার মূল ভিত্তি। ফলে লেখক গদাধরের বাল্যলীলার ঘটনাগুলিকে কাল পরম্পরায় তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। একই সঙ্গে এসেছে তাঁর জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিও। সেদিক থেকে উপন্যাসের সংজ্ঞা ও গঠনকে এতটুকু উপেক্ষা করা হয়নি। বরং অলৌকিকতার বাতাবরণকে স্বীকার করেও লেখক গদাধর চরিত্রটি যেভাবে রচনা করেছেন তা কখনোই সন্ত জীবনের অধিকারী কোনো অলৌকিক মহিমাসমন্বিত বালকের কথা মনে হয়নি। এখানে সে যেন আর পাঁচটা বালকের মতোই—

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়, টোলে যায়, পুঁথি পাঠ করে। ছোটোবেলার প্রায় সকল ঘটনাকে সন্নিবেশিত করে লেখক সুচারুভাবে তা পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থে। ফলে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে কামারপুকুরের একটি বালকের গল্প।

এই গ্রন্থের তৃতীয় উপন্যাস 'পায়ে পায়ে পথচলা' (২০১৪) সম্পূর্ণতই মা সারদাদেবীর জীবনকাহিনি। তবে জীবনীতে যাওয়ার আগে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস অনুসন্ধানে রত হয়েছেন। তারপর সারদাদেবীর জীবনের নানা ঘটনাকে খণ্ড খণ্ড চিত্রে উপস্থাপিত করেছেন। স্বামী হিসেবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাঁর অনুপ্রবেশ। বাকিটা আপন সত্তায় দেবী সারদার মর্ত্যলীলার কাহিনিমাত্র।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অপর দুই ছোট উপন্যাস 'অশেষ' (২০০৬) ও 'হৃদয়ের এঁড়ে বাছুর' (২০০৬) একমলাটে 'অশেষ' নামে প্রকাশ পায় ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রিম পাবলিশার্স থেকে। 'অশেষ' (২০০৬) নামক উপন্যাসটিতে নয়টি পরিচ্ছেদ আছে, তবে তা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুষঙ্গ বিভিন্ন ঘটনাকেন্দ্রিক। ঘটনার ক্রম-পরম্পরা নেই, ঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন অংশ—বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বর, শ্যামপুকুর ও কাশীপুরের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। সমান্তরালে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে কামারপুকুরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। তবে উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর পর্ব দিয়ে :

> "আকাশে আলো ফুটেছে। দক্ষিণেশ্বরের আকাশে। পঞ্চবটীর অন্ধকার পশ্চিমে গঙ্গার দিকে পালাচ্ছে। কার্তিকের শিশির পাতা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। শীত আসছে। শান্ত গঙ্গা ভোরের আলোয় ভাসছে।"[৮৫]

এই গ্রন্থে সঞ্জীবের গল্প বলার ধরনটি একটু অন্যরকম। তৃতীয় পরিচ্ছেদে যেমন তিনি শুরু করেছেন এইভাবে :

> "ক্যালেন্ডারটা একবার দেখি। ১৮৮২ সাল। অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ। বৃষ্টিবাদলা যা হওয়ার হয়ে গেছে। মৌসুমী মেঘ সাগরে ফিরে গেছে। আকাশ বৃষ্টি-ধোয়া নীল। মাঝে মাঝে উত্তর থেকে ভেসে ভেসে আসছে বৃষ্টিহীন শৌখিন সাদা সাদা মেঘ। কোনোটা রাজহাঁস, কোনটা শুঁড়তোলা শ্বেত হস্তী।

প্রকৃতি শরতের বেশ পরেছেন। রোদের জরি-বসানো নীল শাড়ির আঁচল উড়ছে। শিশিরের নোলক ঝুলছে নাকে।

"আর তিন দিন পরেই দুর্গাপুজো। সরকার এগারো দিন ছুটি ঘোষণা করেছেন। শীত উঁকি মারছে গাছের আড়াল থেকে। পাতা ঝরার কাল। প্রথমে রিক্ত হবে, তারপরে আসবে সবুজের পূর্ণতা। ডালে ডালে কচি কিশলয়ের হুটোপুটি। মাস্টারমশাইয়ের হাত ধরে এই তীর্থে অনেকক্ষণ এসেছি। ভক্তদের বিরামহীন সঙ্গীত এইবার থেমেছে। গঙ্গায় কি জোয়ার আসে। এ যে আনন্দের প্লাবন! কেন এত আনন্দ! আজ যে নরেন্দ্রনাথ এসেছেন।"[৮৬]

প্রকৃতির নির্মোহ সুন্দর প্রেক্ষাপট বর্ণনায় লেখক যেভাবে উপন্যাসের কাহিনিতে পাঠককে প্রবেশ করাচ্ছেন তা দেখার বিষয়। প্রথমেই ক্যালেন্ডার দিয়ে ইতিহাসে প্রবেশ করালেন। তারপর মাস। তারপর দিন। প্রকৃতির সজ্জায় তার সুবিশাল আড়ম্বর। বাস্তবের আনন্দ প্রকৃতিতে প্রতিচ্ছবি হয়ে ধরা দেয়। অবশেষে মাস্টারমশাইয়ের চোখ দিয়ে দেখে নেওয়ার বিষয়টিও বলে দেন। তারপর পাঠক ঢুকে যান গল্পের অন্দরে। একইসঙ্গে প্রধান চরিত্রদুটির প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণময়তা চিত্রিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—গুরু-শিষ্যের জীবন ও কর্মধারাকে তুলে ধরে লেখক এটাই পরিস্ফূট করতে চেয়েছেন যে, দুই তীব্র গতিধারা মানবজীবনে শান্তি ও মুক্তি প্রাপ্তির মোক্ষম উপায়। তাই একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ধর্মীয় চেতনা গৃহীত হয়েছে উপন্যাসে, অন্যদিকে তেমনি বিবেকানন্দের প্রেমচেতনার বিষয়টি উঠে এসেছে। উপন্যাসের শেষ অংশে এই মেলবন্ধন ধরা পড়ে। অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে যুক্ত করে দুই মহান ব্যক্তির অশেষ কর্মধারাকে তুলে ধরেছেন। কারণ অবশ্যই যুগের প্রয়োজনে :

"ওই যে গঙ্গা, বেলুড় মঠের সামনে দিয়ে প্রবাহিত। গভীর রাতে একাগ্র কোনও সাধক আজও দেখতে পাবেন—একটা নৌকা ভেসে চলেছে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে বাগবাজারের দিকে। ডান দিকে বেলুড় মঠকে রেখে। সেই নৌকার হাল ধরে আছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর দাঁড় বাইছেন নরেন্দ্রনাথ—স্বামী বিবেকানন্দ। আর ছইয়ের ভেতর বসে আছেন দুই রমণী। একজন নরেন্দ্রনাথের মা ঠাকুরুণ, জ্যান্ত দুর্গা, জননী সারদা। আর একজন আইরিশ দুহিতা ভগিনী নিবেদিতা। ওই ছইয়ের ভেতর মায়ের স্নেহের আঁচে ঠাকুরের প্রেমে নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানে আর নিবেদিতার বাতাসে তৈরি হচ্ছে এমন

একটি বস্তু, আমাদের এই মহাজীবনের মহামন্দিরে যেটিকে দেবতার ভোগ হিসেবে যুগ যুগ ধরে নিবেদন করা যাবে।”[৮৭]

আসলে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় আশাবাদী। বর্তমান সমস্যাসংকুল পরিবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ যে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক ও আবেদনক্ষম, তা তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাজীবনের আধার।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘হৃদয়ের এঁড়ে বাছুর’ (২০০৬)। এটি মূলত ভাগ্নে হৃদয়ের কাহিনি নিয়ে রচিত। যে মানুষটির সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন হৃদয়—সেই শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি চিনতে পারেননি। যেকারণে হৃদয়ের শেষ পরিণতি কেবল একটা এঁড়ে বাছুর নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ জীবনে মুক্তি প্রাপ্তির পরম মানুষটি যখন ছায়ার মতো থাকেন, তখনও বোধোদয়ের অভাবে তাকে অন্ধকারেই থেকে যেতে হয়। হেলায় নষ্ট হয় জীবন। এই উপন্যাসের বিষয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়ের জীবন থেকে গৃহীত হলেও আসলে তা বর্তমান সময়ের সকল মানুষের জন্য প্রতীকি। যখন আকাশে বাতাসে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব ছড়িয়ে, তখনও মানুষ আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারেনি। তাই সংসারের জটিল ঘূর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে একসময় মৃত্যুবরণ করে। অর্থাৎ জীবনের শেষ সময়ে ওই এঁড়ে বাছুরটুকুই প্রাপ্ত হয়। চৈতন্য আর হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ‘চৈতন্য’ হওয়ার আশীর্বাদই করেছেন।

তবে অবিশ্বাস্যভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি অংশে ‘অশেষ’ উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়টি অবিকৃত ও অপরিবর্তিত অবস্থায় ঢুকে গেছে। উদ্ধৃতি ছাড়া এরূপ প্রতিলিপি হওয়া একেবারেই অনুচিত। এই অংশটি অবশ্যই উপন্যাসের ত্রুটি।

ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক ও তন্ত্রসাধনার কথা নিয়ে লিখলেন ‘ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ’ (১৯৯৯)। যদিও সঞ্জীবের সকল সাহিত্যের মতো এতেও তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়েছে, তবে এখানে সেগুলি আরও নিখুঁত রূপ পেয়েছে। ছোট ছোট বাক্য তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ। তবে এক্ষেত্রে শব্দচয়নে আরও বেশি সচেতন হয়েছেন। দৃশ্য প্রকাশে আরও গভীর মনযোগী

হয়েছেন। উপন্যাসের প্রথম অংশেই দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার তীরে ভোরবেলায় গান গাইছেন আর ফুল তুলছেন। এখানেই ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে দেখা যিনি পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন। তবে এই ভৈরবীই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম চিনেছিলেন অবতাররূপে। এই প্রসঙ্গে লেখকের বর্ণনার ভঙ্গিমাটিও অসাধারণ। ভৈরবী বলেছেন :

> "শাস্ত্র বলছেন, দেবতা হয়ে দেবতার পূজা করবে। তোমার মামা তাই করেন বাবা।'
>
> হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভ্রমর উড়ে এল। কুচকুচে কালো এতখানি ডুমো মতো। শুঁড় দুটো হলুদ। ফুলের পরাগ মেখে এসেছে। ভোঁ ভোঁ করে চক্কর মারছে। ভৈরবী অবাক হয়ে দেখছেন।
>
> হৃদয় বললে, 'বাগান থেকে এসেছে। ভয় নেই কিছু বলবে না।'
>
> 'বলবে না কী? বলছে ত! কত কথা বলছে, বুঝতে পারছ না। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা এনেছে শ্রীরাধিকার কাছে।'"[৮৮]

বস্তুত অংশটি দেখলে বোঝা যায় উপন্যাস রচনায় লেখক কী পরিমাণ সচেতন। একদিকে ইতিহাসের কয়েকটি তথ্য, অন্যদিকে সাহিত্যের চাহিদা। এই দুইকে মিলিয়ে কল্পনার আশ্রয়ে অসাধারণ কথাসাহিত্য রচনায় সক্ষম হন লেখক। তাই কখনো কখনো পরিবেশের নিদারুণ বর্ণনা ঘটনার আবহকে মধুর ও বাস্তবোচিত করে তোলে। তবে পঞ্চম অধ্যায়ের আগে পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বহু ঘটনাকে লেখক প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে এসে দেখা যায়, ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রকথা শোনাচ্ছেন। তন্ত্রসাধনার পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণদেব শম্ভুচরণ মল্লিকের বাড়িতে খ্রিষ্টধর্মও বুঝে নিচ্ছেন। তোতাপুরী ও গৌরী পণ্ডিতের কথা এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। ফলে উপন্যাসটি কেবল ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনও প্রকটলাভ করেছে।

একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হয়ে ওঠার কাহিনি যেমন বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে তাঁর অবতাররূপের প্রকাশ গ্রথিত হয়েছে। ফলে পাঠকের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের গ্রহণীয়তার বিষয়টি দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছে। এমনকী, শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের মধ্যেও সেই দোলাচলতার ছাপ স্পষ্ট হয়। যেমন একটি দৃশ্যে দেখি, পরম সোহাগে মথুরামোহনের দুই হাত চেপে বলেছেন :

"ও সেজবাবু। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব— তবে একটা কথা, যে যা বলে বলুক, তুমি আমাকে অবতার বলে প্রচার কোরো না। আমি মায়ের ছেলে।"[৮৯]

উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে কামারপুকুর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ভৈরবীর বিদায় নেওয়ার দৃশ্য দিয়ে। সেই দৃশ্য বর্ণনাও অসাধারণ হয়ে উঠেছে বিচক্ষণ কথাসাহিত্যিকের লেখনীতে :

"দু গাল বেয়ে জল পড়ছে ভৈরবীর, স্রোতে ভাসতে ভাসতে কাছে আসা, আবার দূরে চলে যাওয়া। সময়ের নৃশংস স্রোত। ভৈরবী বললেন, 'তোমাকে তো আমি বাইরে প্রণাম করতে পারব না, অন্তরে প্রণাম করছি। তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা কোরো। অনেক দুঃখ দিয়েছি, এবার সব আনন্দে থাকো। আমাকে তাড়াতে হয় না, আমি নিজে আসি, আবার নিজেই চলে যাই। যেমন তোমার জীবনে এসেছিলুম একদিন। কে এল, কোথা থেকে এল, যেমন জানো না, কে গেল, কোথায় গেল, তাও জানবে না।'"[৯০]

বস্তুত এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনলীলার থেকেও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে ভৈরবীর জীবন ও জীবন-যন্ত্রণা। শ্রীরামকৃষ্ণকে পরম স্নেহে ভালোবেসে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন তন্ত্রসাধনা। সেদিক থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণকেও একজন শিষ্যের ন্যায় শিক্ষাগ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু ভৈরবীর ট্র্যাজিক জীবন উপন্যাসকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই উপন্যাসে অবতারত্বের স্বীকৃতি পেলেও সাধারণ হয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠার পরিসরে মহত্তর রূপটি পরিব্যক্ত হয়েছে। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই হয়ে ওঠার বিষয়টি অনেকখানি ইহলৌকিক। মহামানবের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের যাত্রাপথ তাই অনেকবেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে।

অপর একটি রচনা 'ধর্মযুদ্ধ' (২০১১)। কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসে নিজের ধর্মের উৎকর্ষসাধনে সক্ষম হয়েছিলেন—সেই বিষয়কে উপজীব্য করে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাস রচনা করেছেন। উচ্চশিক্ষিত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতিনিধি, অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বরের প্রায় লেখাপড়া-না-জানা গ্রাম্য ঠাকুর গদাধর চট্টোপাধ্যায় কালীর উপাসক। ব্রাহ্মরা নিরাকার, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকারও। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসে তিনি ব্রাহ্মধর্মের সীমাবদ্ধতাকে আরো উদার ও মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সর্বস্তরে সকল ব্রাহ্মনেতাকে মানাতে পারেননি বলে একসময় নিজেই সেখান থেকে বেরিয়ে নতুন দল গড়েন। সেসব কথা অনেক পরে।

কিন্তু অনেক ঘাটের জল খেয়ে কেশবচন্দ্র পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে সমস্যাসংকুল আবহ থেকে মুক্তি পেতে চান তিনি। গ্রন্থের প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রভাব ও প্রকাশের কথা বর্তমান। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে উপন্যাসটি কেশবচন্দ্রের জীবনের আধারে রচিত। কিন্তু নামকরণ যখন 'ধর্মযুদ্ধ', তখন যুদ্ধের একটা ভাবনা এসেই যায়। আর তা ঘটেছে উপন্যাসের একেবারে শেষে। আপন জীবনে ক্ষত-বিক্ষত কেশবচন্দ্র বুঝতে পারেন আপন সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা। উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশব সেনের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি জানিয়েই ধর্মযুদ্ধের ইতি টানেন লেখক।

স্বভাবগত লেখনীই সঞ্জীবকে সহজাত পরিচয়ে আবদ্ধ করে। কারণ তাঁর গল্প লেখার সৌকর্যটি তাঁর অন্যান্য অনেক উপন্যাসেই খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হয়নি। যেমন এই উপন্যাসটি শুরু হয়েছে এভাবে :

> "ক্যালেন্ডার বলছে, তারিখ ২৭ অক্টোবর, ১৮৮২। ঘড়ি জানাচ্ছে সময় বেলা চারটে। সকলে সরবে বলছেন, সাবধান, সাবধান, খুব সাবধানে ঠাকুরকে ভেতরে নিয়ে চল। তিনি ভাবস্থ। কেশবচন্দ্র এই মানুষটির জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন। ঝম ঝম করে শুরু হল কীর্তন। জাহাজের কল চলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির, পোস্তা, চাঁদনি, ঘাট পেছনে সরে যাচ্ছে। হু হু বাতাস। শরৎকাল, একই আনন্দ, জাহাজ চলেছে কলকাতার দিকে। দূরে আরও দূরে।"[৯১]

এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সামান্য একটু জায়গা জুড়ে। তাসত্ত্বেও তাঁর আবির্ভাব সমগ্র উপন্যাসটিকে আন্দোলিত করে তোলে। কারণ উপন্যাসের চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁর আবির্ভাব প্রশান্ত জীবন যাপনের সমাধান হয়ে। অবিশ্বাস্য অথচ লৌকিক বিষয় হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ধর্মীয় জগতের পুরোধা হয়ে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পরিচিতিকে প্রকাশ করে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের আরও কয়েকটি উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি এসেছেন, যেমন—'গঙ্গাবক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১২), 'সোনার ধুলো' (২০০৭), 'দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১১), 'কালের কাণ্ডারী' (২০০২) ইত্যাদি। প্রতিটি গ্রন্থেই তিনি প্রতিভাত হয়েছেন আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে। জগতের অধর্ম অনাচার বৃদ্ধির কালে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন যেমন অবতারত্বকে নিশ্চিত করে, তেমনি তাঁর ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে কালের সংকট মোচন সম্ভব—তা প্রমাণিত হয়।

'কালের কাণ্ডারী' (২০০২) উপন্যাসটিতে কালকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন বার্তাকে প্রকাশ করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গে জয়রামবাটীতে মুখোপাধ্যায় পরিবারের আসার কারণটি চিত্রিত হয়েছে ধর্মের ইতিহাস ধরে। তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন বাংলার ইতিহাস। মোগল যুগ থেকে ইংরেজদের কাল পর্যন্ত সময়চিত্র প্রবাহিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। সেইসঙ্গে গদাধরের জীবনকাহিনি বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে কোনো অলৌকিকতা নেই। শেষ অধ্যায়ে ইংরেজদের রাজত্বকাল ও কলকাতার ইতিহাস বর্ণিত। এই পরিসরেই শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতার জীবন ও সেইসঙ্গে তাঁর মহাপুরুষত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। কালের প্রবাহপথে তাঁর ভূমিকা কেবল জন্ম-মৃত্যু নয়, বরং কালের কাণ্ডারী হয়ে মানবসমাজকে পথ দেখানো—সেই চিত্রই এখানে ধরা পড়ে। উপন্যাসের শেষে সেই প্রভাবকে সুদূরপানে ইঙ্গিত করতে বেলুড় মঠ, মায়ের মন্দির, উদ্বোধন প্রভৃতির কথা এসেছে।

'সোনার ধুলো' (২০০৭) উপন্যাসটি সম্পূর্ণতই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আশ্রিত উপন্যাস। চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন চিত্র খণ্ড খণ্ড আকারে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে এই উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ের একটি দৃশ্য তাঁরই লেখা 'অশেষ' নামক উপন্যাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকে হুবহু তোলা। 'সোনার ধুলো'-র ১১৫ পৃষ্ঠা থেকে ১১৮ পৃষ্ঠা হুবহু একই লেখা চোখে পড়ে 'অশেষ' উপন্যাসের ১৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৮ পৃষ্ঠা। সঞ্জীবের উপন্যাসের বেশ কয়েকটিতে এজাতীয় নকল ধরা পড়ে যা কিনা তাঁর সাহিত্য রচনাকে অনেকখানি দুর্বল করে তুলেছে।

'দক্ষিণেশ্বর ও শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১১) উপন্যাসটি বারোটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বর জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির ইতিহাস রচনা করেছেন কথাসাহিত্যের বয়ানে। লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সুনিপুণভাবে ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসেছে রাসমণি ও দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির তৈরির প্রসঙ্গ। উপন্যাসের গতি এগিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধরে। তবে প্রসঙ্গমাত্র যথাসম্ভব বর্ণনা দিয়েছেন কালী মাতার। উঠে উসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন ভক্তদের পরিচিতি ও প্রসঙ্গ। এই উপন্যাসেও তিনি মহাপুরুষ।

উপন্যাসের পরিসমাপ্তিও করেছেন অন্য উপন্যাসগুলির মতোই নরেন্দ্রনাথসহ শিষ্যদের হাত ধরে তাঁর ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা।

'গঙ্গাবক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ' (২০১২) উপন্যাসের নামকরণ লক্ষ করলে মনে হতে পারে গঙ্গায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিচরণ তথা ভ্রমণকে ইঙ্গিত করে এই উপন্যাস লেখা। কিন্তু আসলে তা না হয়ে গঙ্গানদীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের যে যোগ, তা প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। স্বভাবতই এই উপন্যাসের নায়ক বা চালক হল গঙ্গা। উপন্যাসে আছে :

> "মা গঙ্গা গভীর রাতে এই জায়গাটির পাশ দিয়ে বহে যেতে যেতে দেখতেন অন্ধকারে প্রায় একটি জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি কুঠি। জানলায় কাঁপছে মোমবাতির আলো। ঝুলছে নেটের পর্দা।"[৯২]

বস্তুত গঙ্গার প্রসঙ্গ মাঝে মধ্যেই লেখক জানান দিয়েছেন। যেমন, 'মাগঙ্গা এলেন চুপি চুপি দেখতে এ তো তাঁরই সাধনপীঠ', কিংবা 'সর্বদেবদেবী সমন্বিত কাল আর মহাকালের অদৃশ্য একটি পরিমণ্ডল লুটিয়ে রইল মা গঙ্গার এই তটে।' ফলে উপন্যাসটি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রধান না হয়ে গুরুত্ব পেয়েছে গঙ্গার সঙ্গে সময় বা কাল। একই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বর জীবন, বিশেষত গঙ্গার সঙ্গে জড়িত জীবন-চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই উপন্যাসে। সেদিক দিয়ে উপন্যাসটি অন্য মাত্রা লাভ করেছে।

(৮)

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ অধ্যায় নিয়ে লেখা একালের দুটি উপন্যাস ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : শেষ অমৃত'(১৯৯৮ খ্রি) এবং নটরাজনের 'শেষ ২৪৮ দিন'(২০১৫ খ্রি)।

ড. চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের সময়কাল এপ্রিল ১৮৮৫ থেকে আগষ্ট ১৮৮৬। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্রে রেখে লেখক ঘটনা সাজিয়েছেন অন্যান্য চরিত্রগুলির পূর্ববতী জীবনের ঘটনা দিয়ে। যেমন উপন্যাস শুরু করেছেন শ্যামপুকর মেট্রোপলিটন স্কুলের মাস্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সূত্র ধরে।

এই প্রসঙ্গে তিনি মাস্টারমশায়ের কথা বর্ণনা করেছেন এবং বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। একইরকম ভাবে নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গ এলে তাঁর পরিবারের পরিচয় ও তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে এই পরিচয় কাঙ্খিত। কারণ উপন্যাসের শুরুতেই 'লেখকের কথা' অংশে তিনি জানিয়েছেন :

> "আমার উপন্যাসে সেই অর্থে কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। আমি তুলে ধরতে চেয়েছি একজন দেব মানুষের মানবিক আশা আকাঙ্ক্ষা ও যন্ত্রণার কাহিনী। দেবত্ব অর্জন করতে গেলে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের চেয়েও 'গড ম্যানকে' মানবিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। একজন সৎ মানুষের পিছনে থাকে আরও কিছু সৎ মানুষ। এঁদের অনেকেই পাদপ্রদীপের অন্তরালে থেকে যান। আমি সেই সব কিছু মানুষের চরিত্র এঁকেছি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অভ্যুত্থানের অন্তরালে মা সারদার নিভৃত আত্মত্যাগ এবং তাঁর মানুষী দ্বন্দ্বটিকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে আমি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। তেমনি স্বামীজীর জীবন নাট্যের পিছনে বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের হাহাকারকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তেমনিভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি শিল্পী বিনোদিনীর জীবন যন্ত্রণাকে। আর সমস্ত কিছু ছাপিয়ে এই উপন্যাসে বড় হয়ে উঠেছে সময়।"[৯৩]

ফলে বোঝা যায়, লেখকের উদ্দেশ্য ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে রক্তমাংসের করে তোলা। সমগ্র উপন্যাসটির ভিত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ পর্ব হলেও লেখক সেখান থেকেই রসদ পেয়েছেন ঠাকুরের জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণার অনুভূতিগুলি প্রকাশ করার। চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্রণার একটি চিত্র আন্তরিকতার সঙ্গে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা দেখা যেতে পারে :

> "ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়েন মহেন্দ্র। রাত তিনটে নাগাদ প্রচণ্ড গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মহেন্দ্রের।
>
> ঠাকুর কাতরাচ্ছেন।
>
> তাড়াতাড়ি উঠে পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকেন মহেন্দ্র।
>
> ঠাকুর বলেন, বাতাস করবে- আর কাজ নেই-এত কষ্ট আর সহ্য হয় না।
>
> হরিশেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ছুটে আসে সে।
>
> ঠাকুর হরিশের দিকে তাকিয়ে বলেন, সমস্ত রাত ঘুম হয়নি।
>
> চোখ পড়ে যায় মহেন্দ্রের দিকে।
>
> বলে উঠেন,মহিন্দর, আর রক্ষে করতে পারলুম না।
>
> ঠাকুরের পায়ে হাত বোলাতে বোলাতে মহেন্দ্র বলেন, আপনি ভাল হয়ে যাবেন ঠাকুর। ভাল হয়ে যাবেন।"[৯৪]

অংশটিতে দেখা যায় মহেন্দ্রের অসহায়তা ও শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা কোনো অবতারের নয়—এ যন্ত্রণা কেবল এক মানুষের—অসহায়, রোগগ্রস্থ মানুষের। বস্তুত লেখক শ্রীরামকৃষ্ণকে এভাবেই এই উপন্যাসে গ্রহণ করেছেন। সেইসঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলিও সার্থক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পাশাপাশি মহেন্দ্র চরিত্রটি বেশি মাত্রায় আলোকিত।

উপন্যাসের গঠনরীতিও সরল। তেইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিষয়বস্তুতে ঘটনার ক্রমবিন্যাস লক্ষ করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ দেড় বছরের কাহিনি নিয়ে এই উপন্যাসের ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে। তবে লেখক সচেতনভাবে কথামৃতসহ একাধিক আকর গ্রন্থ এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি করলেও সংলাপে নিজস্বতার ছাপ এনেছেন। ফলে কল্পনার আশ্রয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এই উপন্যাসে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটিও সার্থক উপন্যাস হতে বাধা পায়নি।

নটরাজনের(১৯২৮—) 'শেষ ২৪৮ দিন' শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শেষ আট মাসের জীবন কাহিনি নিয়ে রচিত উপন্যাস। উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার হিসেবেই স্বীকৃতিলাভ করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই 'নিবেদন' অংশে লেখক লিখিছেন : " দেবমানব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু লেখার সামান্যতম যোগ্যতাও আমার আছে বলে আমি মনে করি না।..."[৯৫] উপন্যাসেও এই দেবমানবের পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার উপন্যাস রচনাতেও লেখক কেবল ঘটনার ওপর ভিত্তি করে এটি রচনা করেছেন। একটি তথ্যনির্ভর কাহিনি গড়ার দিকেই লেখকের দৃষ্টিপাত লক্ষ করা যায়। যেকারণে শ্রীমা'র কথামৃত, সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী প্রভানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা, অক্ষয় রচিত পুঁথি ইত্যাদি কয়েকটি গ্রন্থ থেকে ঘটনা সংগ্রহ করে তার সাহিত্য রূপ দিয়ে এই উপন্যাস রচনা করেছেন। লেখক নিজেই তা স্বীকার করে 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন :

> "শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তবৃন্দের লিখিত ও প্রামাণ্য বলে বিবেচিত গ্রন্থরাজি থেকে ঐ সময়ের ঘটনাবলী আহরণ করে কাহিনির আকারে লেখার চেষ্টা করেছি, অবশ্য সন-তারিখ, তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি পরিহার করে। চেষ্টা করেছি সেই দিনচর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে, যদিও তা সর্বত্র সম্ভব হয়নি কাহিনি বিন্যাসের প্রয়োজনে। সেই হিসাবে একে হয়তো মোটামুটি বস্তুনিষ্ট বলা

যেতে পারে, তবে তা সময়ানুগত নয়। এর মধ্যে আমার কল্পনাপ্রবণ মনের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না একমাত্র ঘটনার বিস্তার ছাড়া। আমার একমাত্র নজর ছিল নিটোল তথ্যনির্ভর কাহিনি গড়ার দিকে।"[৯৬]

স্বাভাবিকভাবেই লেখকের কলমে একদিকে যেমন কল্পনার স্থান পরিপূর্ণ নয়, অন্যদিকে তেমনি ঘটনায় ঠাসা ২৪৮ দিনের জীবন কাহিনি উপন্যাসটিকে ভারী করে তুলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বকে সূচিত করেই যেহেতু উপন্যাসের শুরু, তাই ভেতরে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না। তবে ঘটনার সাহিত্যিকীকরণ বেশ সাবলীল, যেমন :

"দুপুরে মা সারদা ও লক্ষ্মীদিদি দুজনে মিলে অনেক সাধ্যসাধনা করে সামান্য একটু সুজির মণ্ড খাইয়ে দিয়ে গেছেন। বিছানায় শুয়ে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তন্দ্রাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে 'মা-মা' শব্দ মুখে। দক্ষিণের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে শশী। চোখ তার তন্দ্রাচ্ছন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে। এখন এখানে ডিউটি তার।"[৯৭]

উপন্যাসে প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে লেখকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ কিছু অধ্যায় প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েই শুরু। যেমন নবম পরিচ্ছেদের প্রথমেই আছে :

" ঘন বর্ষায় আকাশে রোদ ও মেঘের খেলা একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আড়াল করে সূর্যকে— অন্ধকারে ঢেকে যায় চারিদিক। আবার তারই মধ্যে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আলোর রশ্মি ছড়িয়ে হেসে উঠেন সূর্যদেব।"[৯৮]

প্রকৃতির পরিচয় দিলেন। আর সেইসঙ্গে প্রকৃতিকে যুক্ত করলেন উপন্যাসের ঘটনায়। এরপরই লিখলেন :

"কাশিপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠরোগ নিয়ে চলেছে তেমনি আলো-আঁধারের খেলা। কখনও রোগের তীব্রতা ভয়ানক বেড়ে উঠে। যন্ত্রণায় ছটফট করেন তিনি।"[৯৯]

এভাবেই লেখক চরিত্রের অবতরণ ঘটিয়ে চরিত্রগুলিকে অনেক বেশি বাস্তবময় করে তুলেছেন।

পরোক্ষ প্রভাব

আমরা উপন্যাসের মধ্যে যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ খুঁজে পেয়েছি পরোক্ষ উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে নানা রঙে আবির্ভূত হয়েছেন। কখনো তাঁর খণ্ডিত জীবন, কখনো প্রসঙ্গে-অনুষঙ্গে, কখনো কেবল ক্যালেন্ডারে স্থান নিয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। এরূপ উপন্যাসের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এই তালিকায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জরাসন্ধ, বিমল মিত্র, শংকর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক।

(১)

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন পরোক্ষভাবে। কখনো সরাসরি নাম ব্যবহার করেছেন, কখনো তাঁর ভাবাদর্শ অনুসরণ করেছেন, যেকারণে শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ছায়াপাত কখনো কখনো ঘটেছে। বস্তুত ধর্মীয় জগতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাড়া জাগানো আলোড়নকে তিনি এড়াতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)-তে একটি বিষয় স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিল্বন নামে এক সন্ন্যাসী যখন পীড়িত পাঠানদের সেবা করছেন, সেই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক লিখেছেন :

> "আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নেই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত। ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনি বা কিসের জাত!"[১০০]

যদিও উপন্যাসটি লেখা হয়েছে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে, স্বামী বিবেকানন্দ তখনও সেভাবে পরিচিত হননি সারা বিশ্বে। কিন্তু সন্ন্যাসী শব্দটির মূল অর্থ ব্যাখ্যা করে যেভাবে সেসময়ে ব্যবহার করেছেন একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাতে পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দকে পাওয়া যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> "ভাবতে অবাক লাগে এ কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৮৮৭ সালে, যখন আমাদের সমাজ জাত-পাতের বিচার ও কুসংস্কারে জীর্ণ, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ যেন এ কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন।"[১০১]

রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'গোরা'-তে (১৯১০) শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শে দীক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দের ছায়াপাত লক্ষ করা যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রে। মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাসটি হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম বিরোধের পটভূমিকায় রচিত। দুটি সংসারের কথা উপন্যাসে বিধৃত—আনন্দময়ীর সংসার ও পরেশবাবুর সংসার। আনন্দময়ীকে দেখানো হয়েছে দেশমাতৃকা রূপে। আনন্দময়ীর পালকপুত্র গোরা আদর্শপ্রাণ চরিত্র। অন্যদিকে পরেশবাবুর সংসারের সুচরিতা গোরার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হন। আবার বিনয়কে জাগরিত করার জন্য ললিতার অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। ফলে চরিত্রগুলি একে অপরের প্রভাবে ক্রম বিস্তৃত ও প্রকাশিত হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে চেতনামুখি ও জাগরণমুখি অভিসন্ধির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ যেসব প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রগুলি রচনা করেছেন তা একদিক দিয়ে যেমন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত হয়েছে তেমনি কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলিও গৃহীত হয়েছে।

'গোরা' ছাড়া আর একটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কথা লিখলেন। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমদিকে বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়িতে রচনা শুরু করেন 'মালঞ্চ' উপন্যাসের, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণকে সরাসরি স্থান দিলেন। তবে চরিত্রে নয়, ফটোতে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত নীরজাকে করলেন উপন্যাসের নায়িকা। আদিত্যের স্ত্রী নীরজা। ঘটনাচক্রে নীরজা মৃত সন্তান প্রসব করলে তাঁরও শরীর অসুস্থ হয়। শুধু শরীরে নয়, মনেও। তাই মধ্যবিত্তের

আশ্রয়দাতা শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোর সামনে নীরজা আত্মসমর্পণ করে। কেঁদে ওঠে। তাঁর খুড়তুতো দেওর রমেনকে সে বলেছে :

> "যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি।"[১০২]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ যত বয়সের দিকে এগিয়েছেন তত সাহিত্যের চরিত্রের দিকে দেখেছেন বেশি। বিশেষত মনস্তত্ত্ব দিকটি। সেদিক থেকে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে আদিত্য যখন অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে তারই বোন সরলাকে ভালোবাসে, তখন চরিত্রগুলির অন্তর্মুখ স্পষ্ট বেরিয়ে পড়ে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি অনেক বেশি আধুনিক ও বাস্তব হয়ে উঠেছে।

(২)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'শ্রীকান্ত' (১ম খণ্ড ১৯১৭, ২য়-১৯১৮, ৩য়-১৯২৭, ৪র্থ-১৯৩৩) উপন্যাসে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও তাঁদের কর্মধারার কথা চিত্রিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ভাই স্বামী বেদানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সন্ন্যাস নেন। তাঁর আদর্শেই এই গ্রন্থের একটি চরিত্র অঙ্কন করেন তিনি, যার নাম দেন বজ্রানন্দ। একটি দৃশ্যে দেখা যায় বজ্রানন্দ ওষুধ নিয়ে চলেছেন কলেরা আক্রান্ত গ্রামে। পথে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়। সেইসূত্রে তিনি মিশনের সন্ন্যাসীদের আদর্শের কথা শোনান যা রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলে যায় :

> "সাধুজী একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, সারাবার মালিক তো আমরা নই দিদি, আমরা শুধু ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু এও দরকার, এও তাঁরই হুকুম।
>
> "রাজলক্ষ্মী বলিল, সন্ন্যাসীতে ওষুধ দেয় বটে, কিন্তু ওষুধ দেবার জন্যেই তো সন্ন্যাসী হতে হয় না। আচ্ছা আনন্দ, তুমি কি কেবল এইজন্যেই সন্ন্যাসী হয়েছ ভাই?
>
> "সাধু কহিলেন, সে ঠিক জানিনে দিদি, তবে দেশের সেবা করাও আমাদের একটা ব্রত বটে।"[১০৩]

আসলে গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস (চার খণ্ডে) বলে অন্যতম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জীবনে আসা বিভিন্ন বাস্তব চরিত্রগুলিই এখানে বেনামে প্রকাশ পেয়েছে বেশি। সঙ্গে লেখকের অদ্ভুত কল্পনাশক্তি ও সাহিত্যপ্রতিভা সংযুক্ত হয়েছে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রেমকথাই বলা চলে এই উপন্যাসের অন্যতম বিষয়। সমাজ বিগর্হিত অবৈধ প্রেম বিষয়টি শরৎচন্দ্র যেভাবে এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন তা বর্ণনাতীত। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন :

> "নিষিদ্ধ সমাজ বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলি তীব্র তীক্ষ্ম সমাজের নারী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীকপূর্ণ বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন তাহাতে তিনি বাঙালির মনের সংকীর্ণ গন্ডির বহুদূর ছাড়াইয়া আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপিন করিয়াছেন।"[১০৪]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি উপন্যাস 'চরিত্রহীন' (১৯১৭)-এও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। উপন্যাসের প্রথমেই আছে :

> "পশ্চিমের একটা বড় শহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা কি একটা সৎকর্মের সাহায্যকল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই শহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে ... । এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলায় কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।
>
> "উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সৎকর্মটা কি শুনি?
>
> "তাহারা কহিল, সেটা এখনো ঠিক জানা নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, ইহাই তিনি আহুত সভায় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিবেন এই সভার আয়োজন ও প্রয়োজন অনেকটা এই জন্যই।"[১০৫]

বস্তুত প্রসঙ্গক্রমে মিশনের কথা এলেও উপন্যাসের মূল বিষয়টিও কিন্তু এইসঙ্গেই জড়িত। প্রাচীন কুসংস্কারগ্রস্থ জীর্ণ সমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করেন। ফলে তা থেকে বেরোনোর রাস্তা বলে দেওয়াটা একজন সুযোগ্য কথাসাহিত্যিক ও দার্শনিকের কাজ। লেখক সেই কাজটিও করেছেন। সমগ্র উপন্যাসটিতে দুটি আখ্যান— সতীশ-সাবিত্রী-সরোজিনী এবং কিরণময়ী-উপেন্দ্র-সুরবালা-দিবাকর। প্রধান প্রেম আখ্যানটি হল সতীশ ও সাবিত্রীর প্রেমের গল্প। ব্রাহ্মণকন্যা বিধবা সাবিত্রী পতিতাবৃত্তি গ্রহণ না করে একটি মেসবাড়ির ঝি-এর কাজ শুরু করে।

সেই মেসের যুবক সতীশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়। অন্যদিকে সতীশের সঙ্গে সরোজিনীর বিয়ের ঠিক হলে সতীশ তা মেনে নেয় নি। আবার কিরণময়ীর চরিত্রটিও একদিকে চরিত্রহীনা। স্বামীর সোহাগ পায়নি বলে ডাক্তার অনঙ্গমোহনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে মূল এই তিনটি চরিত্র একদিকে যেমন সমাজের চোখে চরিত্রহীন অন্যদিকে যুক্তির বেড়াজালে অসহায়।

(৩)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) বিশ শতকের প্রথম ভাগের একজন জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক। তাঁর 'মুক্তিস্নান' উপন্যাসে সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ আছে। এঁদের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এইভাবে, এঁরা মঠে বাস করেন এবং এঁদের চুল খাটো, দাড়ি গোঁফ কামানো, পরনে গেরুয়া কাপড় লুঙ্গির ধরনে পরা, গায়ে গেরুয়া রঙের মেরজাই, পায়ে দড়ির তলা ক্যাম্বিসের জুতো—তাও গেরুয়া রঙ করা।

পুণ্যানন্দ স্বামী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জীবন যাপনে আছে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের মতোই পুণ্যানন্দ বলেন :

> "আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, পরের টাকা নিয়ে যাচ্ছি দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করতে, তা থেকে নিজের জন্যে যত কম খরচ হয় ততই ভাল।"[১০৬]

আবার অন্নদাশংকর রায় (১৯০৪-২০০২) তাঁর 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৪২) উপন্যাসেও মঠ মিশনের কথা তুলে ধরেছেন। সেখানে আছে নায়ক বাদলের জীবনে চারিত্রিক পরিবর্তন ও তার ফলে মঠে যোগদান। এতে নায়কের জীবন আরো মধুর হয়ে ওঠে।

উপন্যাসটি ছ'টি উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে রচিত। এগুলি হল— 'যার যেথা দেশ' (১৯৩২), 'অজ্ঞাতবাস' (১৯৩৩), 'দুঃখমোচন' (১৯৩৩), 'কলঙ্কবতী' (১৯৩৪), 'মর্ত্যের স্বর্গ' (১৯৪০) ও

'অপসরণ' (১৯৪২)। এই প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষয়ে বৈচিত্র্য—রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন—প্রায় সব কিছুই এসে পড়েছে এই উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রথমে সত্য হল সুখী এবং অসত্য হল বাদল। সুখী সত্যকে যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরেছে, কিন্তু বাদল সত্যকে লাভ করতে পারেনি। প্রতিটি খণ্ডেই সুখীর জীবন দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে যা কিনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করে। 'অপসরণ'-এ যেমন সুখী বলেছে , সমাজ আছে, সমাজের কানুন আছে, কিন্তু সেই একমাত্র রিয়ালিটি নয়, চরম রিয়ালিটি নয়। সত্য হল মানুষ। তা যদি না হত তবে রাধাকৃষ্ণের অসামাজিক প্রেম যুগ যুগ ধরে ভারতের হৃদয় অধিকার করত না। বস্তুত এই উপন্যাসটি লেখকের জীবন দর্শনের প্রতিফলন।

বিমল করের (১৯২১-২০০৩) উপন্যাস 'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৯৬৭) -তে দেখা যায় একটি সাধারণ মানুষ নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন অন্ধ মানুষদের জন্য। একটি আশ্রমে থেকে তাঁর এই কর্মসাধনা। বস্তুত এই সাধনা মঠ মিশনের সন্ন্যাসীদের কর্মধারার সঙ্গে মলে যায়। উপন্যাসটি মূলত তিনজন মানুষের দুঃখ বিহ্বলিত জীবনের কাহিনি। এই তিনজন হলেন—সুরেশ্বর, হৈমন্তী ও অবনী। সুরেশ্বর হৈমন্তীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। স্বাভাবিক কারণে সুরেশ্বরের প্রতি হৈমন্তীর অনুরাগ জন্মায়। হাজারিবাগের গুরুডিয়াতে সুরেশ্বরের আশ্রমে হৈমন্তী ডাক্তার হয়ে রোগীদের সেবা করে। এমতাবস্থায় হৈমন্তীর মনে হয়, সুরেশ্বর যেন আর তাঁকে ভালোবাসে না। অন্যদিকে গুরুডিয়াতে অবনী-ললিতার অশান্তির সংসার থেকে অবনী যেন হৈমন্তীকে পেতে চায়। উপন্যাসের চরম পরিণতি আসে যখন নির্মলার মৃত্যু হয়। নির্মলা অনুরক্ত সুরেশ্বরের জীবনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন ঘটে সুরেশ্বরের জীবন। তখনই তাঁর মনে হয়েছে মানুষের জীবন পূর্ণ নয়, পূর্ণ কেবল ঈশ্বর। মানুষ কেবল সেই পূর্ণতার পথে যাত্রী। সুরেশ্বরও যেন নির্মলার মৃত্যুতে এই পথের যাত্রী হয়ে উঠেছে। চক্ষুরোগ নিরাময় আশ্রম তৈরি করে সেও যেন পূর্ণের সঙ্গে মিলিত হতে চেয়েছে।

(৪)

জরাসন্ধের (১৯০২-১৯৮১) 'লৌহকপাট' একটি বিখ্যাত উপন্যাস। কারাজীবনের ঘটনা নিয়ে চারুচন্দ্র চক্রবর্তী 'জরাসন্ধ' ছদ্মনামে তিন খণ্ডে (১ম- এপ্রিল ১৯৫৪, ২য়- ডিসেম্বর ১৯৫৫, ৩য়- সেপ্টেম্বর ১৯৫৮) এই উপন্যাস রচনা করেন। লেখক চাকরিসূত্রে প্রথম পর্যায়ে ডেপুটি জেলার ছিলেন। পরে পদোন্নতি হয়। তবে এই কর্মজীবনের সূত্রেই তিনি জেলের বাইরের ও ভিতরের মানুষের জীবন নিয়ে অনেক সাহিত্য রচনা করেন। 'লোহকপাট' উপন্যাসের প্রথম পর্বে আছে জেলের শাসনব্যবস্থা, চা বাগানের সাহেব ও শ্বেতাঙ্গদের ষড়যন্ত্র, স্বদেশীদের কার্যকলাপ, অত্যাচার ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে জেল-সুপার রামজীবনবাবুর সরল জীবন যাপন ও মানবতাবোধ প্রকাশিত। জেলের বিভিন্ন কয়েদির মানসিকতার চিত্র অসাধারণভাবে চিত্রিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আছে জেলের বিভিন্ন সমস্যায় অপরাধীদের নির্যাতন ও তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের চিত্র। এই পর্বে জ্ঞানদা নামে এক অপরাধিনীর কথা আছে যাঁকে দারিদ্র্যের চাপে অনিচ্ছাকৃতভাবে জেলে আত্মসমর্পণ করতে হয়। কিন্তু সেখানেও তাঁর স্পর্ধিত আচরণ সকলকে অশান্ত করে তোলে। তাঁর স্পর্ধিত আচরণকে শোধরাতে জেলদপ্তর থেকে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি ও এক খণ্ড কথামৃত দেওয়া হয়। এর পরই ঘটল জ্ঞানদার জীবনে অভূতপূর্ব পরিবর্তন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> "রামকৃষ্ণকথামৃত ও রামকৃষ্ণদেবের একখানি ছবি যে অনির্বাণ অন্তর্দাহকে প্রশমিত করিয়া সেই দুর্বিনীতা, বহ্নিস্ফূলিঙ্গময়ী নারীকে কোমলশ্রীমণ্ডিতা, ভক্তিনম্রা পূজারিণীতে পরিণত করিল তাহা মানব মনস্তত্ত্বের একটি চিরন্তন প্রহেলিকা।"[১০৭]

উপন্যাসে দেখা যায় একজন মানবীর মন পরিবর্তনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বস্তুত এ চিত্র কাল্পনিক নয়। বাস্তবের অনুকরণে লেখা এই অংশ সম্পূর্ণতই সত্য। সেদিক থেকে বাস্তবের সমাজে ও মননে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসসদেবের প্রভাবের ছাপ পড়েছে বাংলা কথাসাহিত্যেও। আসলে সাহিত্য সমাজেরই দলিল। তাই বাস্তবের ছবি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রমাণিত হয় যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক বিস্তৃত পরিবেশে অবতার হয়ে কেবল নয়, বরং মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন ও জীবন উত্তরণের দিকটিও উচিত করেন।

শংকরের (১৯৩৩—) 'মনোভূমি' (১৩৯২ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের প্রধান দ্বন্দ্বটির সূত্রপাত ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। স্বামী-স্ত্রী-র মাঝখানে দ্বন্দ্বরূপে হাজির হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা। স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজারী। সর্বক্ষণ তাঁর ধ্যান, তাঁর চিন্তা, তাঁর ভাবাদর্শে চরিত্র গঠন। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী মহৎ চরিত্রের অধিকারী। অন্যদিকে স্বামী একজন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। তিনি মনে করেন কোনো লেখক মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করে যথার্থ কথাসাহিত্যিক হতে পারেনা। তাই তিনিও মহৎ আদর্শ গ্রহণের বিপক্ষে। স্বামী-স্ত্রী-র এই ছোট্ট সংসারে এই ভাবাদর্শ নিয়েই ঝগড়া ও মনোমালিন্য শুরু হয়।

সাহিত্যিক স্বামী আবার যখন সাহিত্য রচনা করেন তখন দেখা যায় তাঁর সৃষ্ট নায়ক জনপ্রিয় হয় তার আদর্শপরায়ণ দৃঢ়চেতা স্বভাবের জন্য। এখানে নায়ক পবিত্র, আদর্শগত প্রাণ। ফলে সাহিত্যিক স্বামীর মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তবে কি তাঁর আচরণ ভণ্ড? কপট? এদিকে উপন্যাসের মোড় ঘোরে স্ত্রীর মৃত্যু হলে। নিঃসঙ্গ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত স্বামী অবশেষে আদর্শ গ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয় ও আশ্রয় চায়। উপন্যাসের শেষে তাই তাঁর ঘোষণা :

> "মাধুরী, তোমার কথা মতো আমি শ্রীরামকৃষ্ণচরণেই আশ্রয় চাইবো। নিত্যদিনের তুচ্ছতায় সময় ব্যয় না করে, আমি ওঁদের কথাই বলে বেড়াবো, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান নিজেই বিরাজ করছেন.....।"[১০৮]

বস্তুত এই উপন্যাসে স্বামী চরিত্রটির উত্তরণ দেখানো হয়েছে। তবে এই উত্তরণ আপনাআপনি আসেনি। চরিত্রের মনোভূমিতে বারংবার তর্ক-যুক্তির জাল রচিত হয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রথম পর্যায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও পরবর্তীতে আপন সাহিত্যের জালেই জড়িয়ে পড়েছে। এখানেই উপন্যাসটির সার্থকতা। একই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর লেখা 'মনজঙ্গল' উপন্যাসটির কথা। সেখানে লেখক জানিয়েছেন : "... আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের মুহূর্তে, যখন আমার বিশেষ কোনো বন্ধু ছিল না, তখন রাধাগোবিন্দ আমাকে বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে অবহিত করেছিল।"[১০৯] বস্তুত এভাবেই লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই উপন্যাসে এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ –বিবেকানন্দের প্রভাব পরিব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁদের ভাবাদর্শও উপন্যাসের মূল কাহিনির সঙ্গে মিশে গেছে।

চিত্তরঞ্জন মাইতি (১৯২২-২০১৩) মূলত কবি। তবে তিনি উপন্যাসের জগতেও সার্থক পদার্পণ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল— 'শেষ প্রহরের ঘণ্টা', 'বিসর্জন', 'অমৃতপুরের যাত্রী', 'মুক্তির দিন' প্রভৃতি। 'মুক্তির দিন' প্রকাশিত হয় 'নবান্নভারতী' পূজাসংখ্যা ১৯৯৬ তে। এই উপন্যাসের প্রেক্ষিতে ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, বিশেষত ভগবানপুর থানায় সংঘটিত আন্দোলন লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটি লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। ফলে উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনিতে বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া লক্ষ করা যায়। সেখানকার গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা মায়াদেবীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন ও উপন্যাসের গতিধারা প্রবাহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারা নিয়েই মায়াদেবীর মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

(৫)

বিমল মিত্রের (১৯২১-১৯৯১) 'সাহেব বিবি গোলাম' (১৯৫৩) উপন্যাসে স্বামী বিবেকানন্দের একটি ঐতিহাসিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সেখানে আছে :

> "হঠাৎ জনসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেল। চীৎকার উঠলো—জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়—জয় বিবেকানন্দ স্বামিজী কী জয়। ...
>
> "মানব সমাজে যেন এম মহামানব এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত ভারতবর্ষের আত্মা মথিত করে নবজন্ম গ্রহণ করলো যেন এক অনাদি পুরুষ। ...
>
> "হঠাৎ ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঘোড়াগুলোকে খুলে দিল তারা। তাদের উপাস্যকে তারা নিজেরা বহন করবে। স্বামিজীকে তারা মাথায় তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তাদের অন্তরের উৎস আজ অবারিত।—জয় স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়।"[১১০]

পাশ্চাত্য জয় করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন দক্ষিণ ভারত হয়ে কলকাতায় পৌঁছান সেসময়ে যুবকদের উত্তেজনাকে তুলে ধরেছেন এই অংশে।

উপন্যাসটি বলা চলে পুরানো কলকাতার ইতিহাস। ভূতনাথ চরিত্রের অন্তরালে লেখক বর্ণনা দিয়েছেন সে ইতিহাসে। তিনি লিখেছেন :

> "আর ওই দেখছো আমাদের এই তেরো নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ির উলটোদিকে গোল গোল থামওয়ালা বাড়িটা, ওইটে হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের মন্দির। সতুর কথা শুনে মনে হতো দু'দিকের দুটো বাড়ি একই সঙ্গে গজিয়ে উঠেছে—একটা ব্রিটিশ সামন্ত যুগের শোষণ-শাসনের পাকাপোক্ত ভিত আর একটা ঠিক বিপরীত, সামন্ততন্ত্রের মূলের ওপর প্রথম বিদ্রোহ, প্রথম বজ্রাঘাত রামমোহন রায়ের প্রতীক।"[১১১]

স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসে এসেছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের কথা। অন্যদিকে রাধার কথা, ভূতনাথের বন্ধু ননীলালের প্রসঙ্গ, ছোটবৌঠান, ভৃত্যবংশীসহ সমাজের বিভিন্ন মানুষের কথা উঠে এসেছে।

কলকাতার ইতিহাস নিয়ে লেখা অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) 'প্রথম আলো' (১ম-১৯৯৬, ২য়-১৯৯৭)। উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি ১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নগর কলকাতার ইতিহাস। স্বাভাবিকভাবেই এই ঐতিহাসিক দলিলের অন্যতম স্বাক্ষর থাকল রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগিনী নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখ চরিত্র। একই সঙ্গে সেইসময়ের সমাজচিত্র, ধর্মীয় বাতাবরণ, অস্থিরতা, রাজনীতি উঠে এসেছে। ধর্মীয় আন্দোলনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন, সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের চিত্রও লক্ষ করা যায়।

তবে স্বামী বিবেকানন্দের সূত্র ধরে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সন্ন্যাসীর কথা এসেছে, এ প্রসঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা না বললেই নয়। বস্তুত লেখকের চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ যেখানে রক্তমাংসের মানুষ, সেখানে মঠ-মিশনও একটি সেবাক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এই উপন্যাসে। এতে তিনি সময়কে ধরতে চেয়েছেন,যেখানে স্থান হল নগর কলকাতা, চরিত্র হল বিশেষ কয়েকটি। সেই সময়ের মধ্যে রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞানের সক্রিয় জাগরণ ও প্রভাবকে বেছে নিয়েছেন লেখক। স্বাভাবিকভাবেই তিনি কলকাতার জনজীবনের একটি সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্রিয়। সেদিক থেকে নির্বাচিত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা উপন্যাসটিকে অনেক

প্রাণবন্ত করেছে। তথাকথিত জীবনী গ্রন্থ বা অতিরিক্ত ভক্তিকে অগ্রাহ্য করে লেখক নিরপেক্ষভাবে কালের প্রধান চরিত্রগুলি এঁকেছেন। ফলত উপন্যাসটির গতিময়তা অনেক বেশি সহজাত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে 'লেখকের কথা'-য় লিখেছেন :

> "ভক্তিবাদ আমার বিষয় নয়। যাঁরা আমাদের দেশে মহাপুরুষ হিসেবে গণ্য, তাঁদের রক্তমাংসের মানুষ হিসেবেই আমি দেখাতে চেয়েছি। জন্ম থেকেই কেউ মহাপুরুষ হয় না। সাধারণ মানুষের মতনই তাঁদের কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, কখনও দু'একটা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। স্বামী বিবেকানন্দের তামাক ও ইলিশ মাছের প্রতি আসক্তি, কৌতুক প্রবণতা, কৌতুকের ঝোঁকে প্রাকৃতজনের মতন ভাষা ব্যবহার, তাঁকে আমাদের অনেক কাছের করে তোলে। রবীন্দ্রনাথও কখনও কখনও দুর্বল হয়ে পড়েছেন, মাঝে মাঝে অবিবেচকের মতন এমন ভুল করেছেন ..., যে জন্য নিজেকে গর্দভ পর্যন্ত বলেছেন। কিন্তু এতে সেই মহান কবি ও মহান মানুষটির অসাধারণত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। সাধারণ অবস্থা থেকে, ভুল ভ্রান্তির পথ ভেঙে ভেঙে অসাধারণত্বে উন্নীত হওয়ার কাহিনীই অন্যদের প্রেরণা দিতে পারে।"[১১২]

সুতরাং এই দীর্ঘ মহাকাব্যময় উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন কেবল সময়ের নিরিখে একজন লেখাপড়া-না-জানা অথচ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসেবে, যাঁর জীবৎকালে পরিচিতি সেরকম না থাকলেও পরবর্তীকালে প্রচার প্রসার লাভ করে মঠ মিশনের মধ্য দিয়ে। সমকালীন ইতিহাসের প্রামাণ্য পাতায় এই তথ্য যথার্থ ও এই উপন্যাসে তা সার্থকভাবে প্রকাশলাভ করে।

(৬)

বিশ শতকের একজন প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৫) উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে উপন্যাসের দুটি চরিত্র সত্য ও নবকুমারের কথোপকথনে :

> 'ব্রাহ্মধর্মও হিন্দুধর্ম। কান দিয়ে শোন না তো কিছু? এই যে আজ অত বড় ব্রাহ্মসমাজের চাঁই কেশব সেনের বাড়ি পরমহংস এসেছিলেন—'
>
> 'কী কী! কোথায় এসেছিলেন?'

‘পরমহংসদেব, —বলি তাঁর নামটাও কি শোন নি কখনো?’

‘শুনব না কেন?’ বেজার মুখে বলে নবকুমার, ‘দক্ষিণেশ্বরে দেখেও তো এসেছি সেবার আপিসের বন্ধুদের সঙ্গে। তা তিনি—’

‘হ্যাঁ, তিনি কেশব সেনের বাড়িতে এসেছিলেন। সেই দেখতে তো আজ আমার এত দেরি, আর তোমাদের কাছে সব ফাঁস!’[১১৩]

তবে উপন্যাসের মূল বিষয় গ্রাম্য জীবনধারায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা ও চেতনা আনয়নের প্রতিশ্রুতিময় ইতিহাস। উনিশ শতকের কলকাতায় নগরকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু গ্রামের মেয়েদের কাছে তা ছিল স্বপ্ন। এই উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতী এইরকমই একটি চরিত্র যে বাংলাদেশের সেই অজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বয়ে আনে। সাত বছর বয়সে বিয়ে হওয়া সত্যবতী পিতার কাছ থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখে। শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে কেউ শায়েস্তা করতে পারেনা। আবার দেখা যায় নবকুমারের অসুখ করলে গ্রাম্য কুসংস্কারকে সত্যবতী গ্রহণ করতে পারেনি। সত্যবতীর কথা মেনে ডাক্তার দেখানো হলে নবকুমার নবজীবন লাভ করে। আর সত্যবতীকেও জীবনদাত্রী হিসেবে মেনে নেয়। ফলে দেখা যায়, সত্যবতী চিরকাল অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, প্রতিরোধ করেছে। একা নিজে সকল সমালোচনাকে সকল কুসংস্কারকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। উনিশ শতকের গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় সত্যবতী নারীজাতির চেতনা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে।

মৈত্রেয়ী দেবীর (১৯১৪-১৯৯০) ‘ন হন্যতে’ (১৯৭৪) উপন্যাসে একটি চিঠির অনুষঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা উঠে আসে। সেটি লেখিকার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক ফরাসী যুবক ইউক্লিড মির্চা। তিনি দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে পড়াশুনার জন্য ভারতে আসেন ও লেখিকার পিতার অন্যতম ছাত্র হিসেবে পরিগণিত হন। সেইসূত্রে লেখিকার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় লেখিকার পিতা। ফলে মির্চা লেখিকার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণের কালে মির্চা স্বর্গাশ্রম থেকে লেখিকাকে

যে চিঠি লেখেন তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে তাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধকদের মধ্যে অন্যতম সাধকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। চিঠিতে আছে :

> "আমার বৈরাগ্যের কথা যখন ভাববে তখন ইউরোপীয়দের মত ভেবো না। ভারতীয় হও। তুমি আমার চেয়ে ভালো বুঝবে কেন যীশুকে মরুভূমিতে বিশ বৎসর সাধনা করতে হয়েছিল, তাঁর বাণী পৃথিবীতে প্রচার করার আগে। ... আমি তাড়াতাড়ি সংসারে ফিরতে চাই না। রামকৃষ্ণের দরজার কাছে সারা বিশ্ব এসে গেল যখন তিনি সিদ্ধ হলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবী ঘুরলেন; তবু কাউকে দীক্ষিত করতে পারলেন না। অনেক বাগ্‌বিস্তারে লাভ নেই—সাধনার অর্থ দেশ ঘোরা আর বই লেখা নয়। অন্ততঃ আমার কাছে সাধনার অর্থ অন্য কিছু ও অনেক বেশী কিছু। — ১০.১১.১৯৩০"[১১৪]

বলাবাহুল্য, এই মতামত সম্পূর্ণভাবে মির্চার। তাই এই মতের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব যে খুব বেশি ছিল তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। বিবেকানন্দ সম্পর্কে পত্রলেখক ভুল তথ্য পরিবেশন করলেও এই দুই মহান পুরুষের প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন তা লক্ষ করা যায়।

শংকর তথা মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (১৯৩৩—) লেখা উপন্যাস 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত' (১৯৯৮)। গ্রন্থের প্রচ্ছদে লেখক জানিয়েছেন : "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে বাংলায় প্রথম রহস্য উপন্যাস"। সুতরাং গ্রন্থটি না পড়লেও কেবল প্রচ্ছদ থেকেই জানা যায় রহস্য উপন্যাস লিখতে চেয়েছেন শংকর। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন :

> "যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন লীলাকথাকে নির্ভর করে এদেশে শতাব্দীর অধিক সময় ধরে সংখ্যাহীন জীবনী, স্মৃতিকথা, কথামৃত, কবিতা, সঙ্গীত, উপন্যাস, নাটক, যাত্রা ও চলচ্চিত্র রচিত হয়েছে। অভাব ছিল একটি রহস্যকথার। সেই অভাবমোচনের উদ্দেশ্যেই ইতিহাসের পটভূমিকায় এই রহস্য-উপন্যাসের পরিকল্পনা।"[১১৫]

বস্তুত, লেখক সচেতনভাবেই এবং একপ্রকার বাংলা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে রহস্য উপন্যাসের অভাববোধ থেকেই এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন তা স্পষ্ট।

পূর্বসূরী লেখকদের নানান রচনা থেকে বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করে লেখক সেগুলিকে রচনায় মিশিয়ে ইতিহাসকে সক্রিয় করেছেন। গ্রন্থটির মূল সময় ১৮৮৬ তে শ্রীরামকৃষ্ণের পরলোক গমন ও তাঁর অস্থি সংগ্রহের সময়কালে দাঁত চুরি। ঠাকুরের এক গৃহী শিষ্য বংশগোপাল বিশ্বাস। প্রতি কাজেই তার দেরি বলে শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়াতে তাঁর অভয় আশীর্বাণী থেকে তিনি বঞ্চিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর সময় তিনিই চুরি করে নেন একটি দাঁত। আর সেটিই একশ বছর পর বর্তমান সময়ে তাঁর প্রজন্মের কাছে রহস্য হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান সময়ের বর্ণনায় যেসব চরিত্রগুলি রচিত হয়েছে তার বেশিরভাগই কাল্পনিক। চমচম পত্রিকার সম্পাদক হরিময়বাবু, পিকলু, লেখক ভবনাথ সেন, মিস্টার সামতানি প্রমুখ চরিত্রগুলি সবই উপন্যাসের রহস্যঘন পরিবেশের কাল্পনিক চরিত্র। তবে পরোক্ষে এসেছে বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ-গবেষক স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ। এগুলি বাস্তব চরিত্র অনুকরণে সৃষ্ট। বংশগোপাল বিশ্বাস ও তাঁর বংশ—পুরোটাই কাল্পনিক। কেবল সত্য হল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ঘটনাগুলি। গ্রন্থের প্রথমেই লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিস্ময়কর তথ্যগুলির সূত্র বা আকরগ্রন্থগুলির তালিকা দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি’, ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ’, ‘শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা’-সহ মোট তেরটি গ্রন্থ থেকে।

উপন্যাসটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন অবতাররূপে। তাঁর সংস্পর্শ পেতে সেযুগের বংশগোপাল খুব উৎসুক ছিলেন। কিন্তু ‘লেট লতিফ’ বলে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শ পেতে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল। এখানে বংশগোপাল চরিত্রটি লেখকের অভাবনীয় সৃষ্টি। শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর পূতাদি সংগ্রহকালে তাঁর শ্রীদন্ত সংগ্রহে বংশগোপালের ভূমিকাটি অনৈতিহাসিক। কিন্তু লেখক এমনভাবে বাস্তবের ইতিহাসকে উপন্যাসের কল্পনায় মিশিয়েছেন, যাতে করে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে অজ্ঞাত পাঠক বংশগোপালকেও বাস্তবের চরিত্র ভেবে নিয়ে ভুল করবে।

গ্রন্থটি অবশ্যই রহস্য উপন্যাস। রোমাঞ্চে ভরা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীদন্ত উদ্ধারে পিকলু যেভাবে উদ্যোগী হয়ে সফল হয়েছেন তা বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা নেই। ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে যেখানে সংশয় সেই দাঁত চুরির সময় থেকে বাকিটা কল্পনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের শেষজীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসের প্রয়োজনে। এতে ধারাবাহিকতা নেই। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু হওয়ার ঘটনাটি কিংবা তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী অংশটি সুন্দর বর্ণিত হয়েছে। বংশগোপালের চিঠিতে এইসব তথ্য ধরা পড়েছে। তবে নামকরণে আপত্তি থেকে যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-র অনুকরণে লেখক নাম দিয়েছেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত'। কিন্তু রহস্য অমৃতের ন্যায় হয়ে ওঠেনি। রহস্য রহস্যই। তা অমৃত হয়েছে কি হয়নি তা তো পাঠক বিচার করবেন। তবে নামকরণে লেখকের অবাধ স্বাধীনতা। এখানে কোনো প্রশ্ন চিহ্ন থাকে না।

উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান। তাই ভগবানের দাঁত উদ্ধার এবং তা ধারন বা স্পর্শ করলে যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত উদ্যোগীরা। এমনকী, এই কারণেই তার দামও আকাশ ছোঁয়া হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৬ –) 'একা' (১৪০৪ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে পরোক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিবিড়ভাবে উঠে এসেছেন। অথচ উপন্যাসটি রুমকি ও মধ্যবয়সী এক ব্যক্তির গল্প। উপন্যাসটির সূচনাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি লক্ষণীয় :

> "বসে আছেন তিনি!
>
> "ঠিক যেমন বসে থাকতেন গত শতাব্দীতে। বাইরেটা অনেক বদলে গেছে। বৈষয়িক জগৎ তো পাল্টাবেই। ... তবু তিনি আছেন। বাস্তবের খাটে, ভাবের জগতে, ভক্তির দৃষ্টিতে।
>
> "তিনি বসে আছেন, সব শূন্যতা পরিপূর্ণ করে। বসে আছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।"[১১৬]

ফলে উপন্যাসের প্রথম থেকেই যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব লক্ষ করা যায়, তেমনি তাঁর ভগবান রূপটিও ধরা পড়ে। এরপরেই উপন্যাসের গল্প এগিয়েছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি মায়া ও আকর্ষণের সূত্র ধরে। এখানে কামিনী হল রুমকি আর সে-ই লেখককে তাঁর মোহে আবদ্ধ করতে চায়। সম্পর্কে লেখক রুমকির কাকাবাবু। তবু রুমকির ঔদ্ধত্যপনায় লেখক অতিষ্ঠ ও ভীত

হয়ে ওঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে দীক্ষিত লেখক সর্বদাই গুরুর চিন্তায় রত থেকেছেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্তও হয়েছেন। কিন্তু রুমকির মায়াকে লেখক এড়িয়ে যেতে পারেন নি। লেখকের কথায় :

> "যখন সে আমার বউ হয়নি তখন আমার দৃষ্টি ছিল একরকম। এখন অন্যরকম। তখন ছিল আকর্ষণ। একটা দেহ। আমার কামনা বাসনায় সিক্ত। এখন সমর্পণ। নির্ভরতা। আত্মার আত্মীয়।"[১১৭]

অবশেষে রুমকি সন্তান সম্ভবা হয়। লেখকের সন্দেহ জন্মে এই সন্তান শানুর। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় রুমকি বাথরুমে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। শানুও মারা যায়।

সমগ্র উপন্যাসটিতে লেখকের বয়ানে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে বহুবার। কামিনীর মায়া থেকে আপনাকে বাঁচার জন্য সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে থাকতে চেয়েছেন লেখক, কিন্তু পারেননি। তাই রুমকির কাছে তাঁর মুখোশ খুলে গেছে। যেকারণে একসময় তাঁর মনে হয়েছে এর থেকে শানু ভালো, কারণ তার ভেতর কোনো কপটতা নেই। বস্তুত বাস্তবের মাটিতে এ জাতীয় চরিত্র সহজেই দেখা মেলে। মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষ এভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চান। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতি যেন তাকে বদলে ফেলে। আর একারণেই নেমে আসে যন্ত্রণা ও একাকীত্ব। সেদিক থেকে উপন্যাসটির নামকরণ যেমন সার্থক হয়েছে, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় জীবন প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে।

তাঁর লেখা অপর একটি উপন্যাস 'দীনজনে' (১৩৯৬-৯৭ বঙ্গাব্দ) দুই খণ্ডে বিভক্ত। উপন্যাসটি বিলু ও ছবির জীবন কাহিনি। এর প্রেক্ষিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ ও তাঁর বাণী-গল্প সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)) বিলু ও ছবির ছেলেবেলার গল্প আছে। অনাথ বিলু বড় হয় গোকুল কাকার বাড়িতে। তাঁর মেয়ে ছবি বিলুর সমবয়সী। গোকুল কাকার নিয়মনিষ্ঠ আশ্রমিক পরিবেশে ছবির সাহচর্যে বিলু বড় হয়ে ওঠে। ক্রমশ ছবি ও বিলু ঘনিষ্ঠ হয়। শৈশবে একসঙ্গে খেলতে গিয়ে এক অসুস্থ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তাকে বাড়িতে নিয়ে এলে তাঁর পরিচয় মেলে—তিনি মহাবিপ্লবী পবিত্র সান্যাল। এরপর তাকে বাঁচাতে ছবি ও বিলু পাঁচু ঠাকুরের কাছে যায় সাধনা শিখতে। পাঁচু ঠাকুরও শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্ত প্রাণ। কথায় কথায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প বলেন। বিলুর মনে হয় :

"মানুষটার এতটুকু বিরক্তি নেই। একেই বলে অন্যের জন্য বাঁচা। ঠাকুরের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে কেবলই মনে হচ্ছিল, বড় হয়ে আমি যেন অমন হতে পারি।"[১১৮]

এরপর দেখা যায় সন্ন্যাসীকে বাঁচানোর জন্য সবাই তৎপর হয়। গোকুলবাবুর বাড়িতে হোম হয়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায় না। গোকুলবাবু পাঁচু ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস নেন ও সেইমতো তার আশ্রমে জীবন কাটাতে থাকেন। বিলুও বড় হয়ে সন্ন্যাসীর কাছে সাধনা শিখতে শুরু করে।

বস্তুত 'দীনজনে' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি এখানেই। বিলুর জবানবন্দীতে সমগ্র উপন্যাসটি সঞ্চারিত হয়েছে। তবে মধ্যে মধ্যে এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। সে প্রসঙ্গ আনয়নে বিলুর মনোভাবনা কাজ করেছে। এমনকী, বিলু যেন তাঁর জীবনের সমগ্র কাহিনি বলে গেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে বসে। এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন :

"আমার গোকুলবাবা, নতুন মা ছিলেন সাধুর মতো। বাড়িটা আশ্রম। সেখানে আমার মতো মর্কটও মানুষ হতে বাধ্য। সেদিন আপনি যখন আমাকে সেই গল্পটা বললেন তখনই আমার মনে হল, আমার সংস্কারটা বোধহয় তেমন ভালো ছিল না। কোন্ গল্পটা জানেন? গল্পটা আপনি আমারই মতো এক ছোকরাকে বলেছিলেন। তার ভেতরে আমারই মতো কিছু একটা নড়াচড়া করছিল, টিকটিকি কি গিরগিটি। ... অথবা আপনার সেই পরম বিস্ময়ের মানুষটি, সেই হরিবাবু। ঠাকুর সেই হরিবাবু। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন আপনার দর্শনে।"[১১৯]

আবার উপন্যাসে কখনো একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কোনো একটি কাহিনি দিয়ে। যেমন প্রথম অধ্যায়েই আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টারমশাইয়ের কথোপকথন, অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম অংশ নেওয়া হয়েছে কথামৃত থেকে, তারিখ ৬ মার্চ ১৮৮২। ফলে এই উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্নভাবে এসেছেন। বিলুর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের ভূমিকা অনেকখানি। তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে এই ভাবাদর্শের পরিসরেই। তাই ঠাকু রামকৃষ্ণের কাছে যেন তাঁর অতীত জীবনের কাহিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, শুধু স্বীকার নয়, কীভাবে তাঁর ভাবাদর্শ আপন জীবনে ভাবময় হয়ে থাকতে হয় সেই চিত্রও প্রকাশিত হয় বিলুর বলা আত্মজীবনীতে। সেদিক থেকে বিলুর মনস্তত্ত্বগত দিকটিরও প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে।

দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৯৭ বঙ্গাব্দ) আছে বিলুর পবিত্র জীবনের কথা। সন্ন্যাসীর কাছে উপস্থিত হয় লকা, অধ্যাপক। এই অংশে ছবির ভূমিকা শক্তিপ্রদায়িণীরূপে। তাই আশ্রমটাও যেন মেয়েদের আশ্রম হয়ে

যায়। সেখানে স্কুলও খোলা হয়। বিলু থেকে যায় ছবির মায়ের কাছে। অবশেষে সে উপার্জনের জন্য বিভিন্ন বই পড়ে শোনানোর কাজ পায় জমিদার প্রাণগোপাল চৌধুরীর বাড়িতে। তবে এই খণ্ডেও শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। শেষের একটি অংশ দেখা যেতে পারে :

> "আজ আপনাকে বলি ঠাকুর, কোনও তুলনা নেই আপনার। আপনারই অতি প্রিয় শিষ্য গিরিশ ঘোষ মশাই 'চৈতন্যলীলা'য় লিখেছিলেন গান...।"[১২০]

দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে পরিচালিত বিলুর জীবন সুন্দরভাবে প্রবাহিত হয়। বস্তুত সন্ন্যাসী না হয়েও গৃহে থেকে যেভাবে একটা পবিত্র জীবন তৈরি করা যায়, তার প্রমাণ ও উপায়স্বরূপ বিলুকে চিত্রিত করেছেন। সেইসঙ্গে তাঁর আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ভাবজীবন ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপুরুষ, আদর্শ চরিত্র, যাকে অবলম্বন করে জীবন পথে পবিত্রভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে বিলু ও ছবির পারস্পরিক সম্পর্ক, সন্ন্যাসীর অবিচলতা ও নিষ্ঠা, গোকুলবাবার নিয়মনিষ্ঠ জীবন বাস্তবের আঙিনা থেকে তুলে নেওয়া নির্যাস বিষয় হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে। সেদিক থেকে উপন্যাসটি সার্থক রূপ লাভ করেছে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অপর একটি উপন্যাস 'লোটাকম্বল' (১ম খণ্ড ১৯৮৫, ২য় খণ্ড ১৯৯২) লেখকের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। এতেও দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শে লেখকের জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে। জয়নারায়ণের গান করার প্রসঙ্গে এসেছে স্বামী বিবেকানন্দের কথা। আবার সন্ন্যাসীর কথাবার্তায় শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব বিস্তারলাভ করেছে অতি সহজেই। আবার উপন্যাসের শেষ অংশে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক বাতাবরণটি প্রসঙ্গক্রমে উত্তাপন করেছেন লেখক :

> "ঠাকুর কীভাবে জেনেছিলেন! মনকে যদি বিশ্বমন, চোখকে যদি বিশালের চোখ করা যায়, তা হলে সবই জানা যায়। একবার ঠাকুরের এক ভক্তের পালিতা কন্যার কলেরা হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণকে স্মরণ করেছেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। অর্থাৎ শোনা যায়। বহু দূর থেকেও শোনা যায় ভক্তের কাতর ডাক।"[১২১]

বস্তুত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাসে চরিত্রগুলি এসেছে এবং লেখকের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে বিভিন্নভাবে। লেখকের জীবন প্রবাহের বিভিন্ন দিক যেমন ধরা পড়ে, সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ এসে উপস্থিত হয় সময়ে সময়ে।

একালের অপর এক খ্যাতমান লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০—)। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ হল—'বীরাসন', 'পৌর্ণমাসী'। 'মধুকর', 'রসিক', 'রাজদরবার', 'যে দেশেতে রজনী নাই' ইত্যাদি। 'আত্মারামের কৌটা' (১৪২০ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। উপন্যাসটিতে দুটি সময়কাল—একটি শ্রীরামকৃষ্ণের, অন্যটি বর্তমান কলকাতা। একই সঙ্গে এসেছে নরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের কথা।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে, যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গলার বেদনা অনুভব করেন। পরের চিত্রটি ২০১২ সালের। ফলে কলকাতার সেকাল ও একালের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে দুই মেরুতে। বিরানব্বই বছরের ব্রজনাথ পালের নাতি পিলু এই উপন্যাসের একটি আধুনিক চরিত্র। সেকালের কলকাতায় নরেন দত্ত এবং একালের কলকাতায় পিলুর পরস্পর বিপরীত জীবন যাপন, অন্যদিকে বিরানব্বই বছরের ব্রজনাথ ও সেকালের মহেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনের পার্থক্য দেখিয়েছেন লেখক। আসলে জীবনে ও মননে কতখানি বদলে গেছে নগর কলকাতা—তা-ই এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু। স্বভাবতই প্রথমবার উপন্যাসটি পড়লে সামান্য কষ্ট হলেও এই পার্থক্য বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বাস্তবধর্মী। মদ্যপায়ী পিলু চরিত্রটি বর্তমান মদ্যপ, আদর্শহীন যুবকদের ইঙ্গিত করে। ব্রজনাথ যেন গড্ডালিকা প্রবাহে চলে যাওয়া কামিনী-কাঞ্চন লোভী বৃদ্ধ। মৃত্যুর আগেও সে মাঝবয়স্কা আয়াকে দেখে খাবি খায় : "আহা—কী মুঠিমাপ স্তন।"[১২২] সুতরাং দেখা যায় উপন্যাসটি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে সামনে রেখে কলকাতার সেকাল ও একালের জীবন যাত্রার পার্থক্যকে সূচিত করে।

সুতরাং লক্ষণীয় বিষয় যে, কথাসাহিত্যের অঙ্গনে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব বিভিন্নভাবে। কখনো মানুষ হয়ে, কখনোবা মানুষ থেকে অবতারে। কখনো ধর্মীয় সাধক হয়ে, তো কখনো সমাজ-সংস্কারক হয়ে। কখনোবা মধ্যবিত্ত জনমানসে একান্ত আশ্রয়দাতা হয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে প্রত্যক্ষ কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাসের পরিমাণ হাতে গোনা হলেও পরোক্ষ প্রভাব অনেকখানি। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের প্রভাবে অনেক উপন্যাস লেখা হলেও হয়তো প্রমাণাভাবে তা প্রভাবিত বলে স্বীকার করে নিতে কষ্ট হয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ মনন ও মানসিকতায় যখন সেবাই প্রধান কিংবা জীবনের উদ্দেশ্য

‘পরহিতায় চ জগদ্ধিতায় চ’, তখন আরো অনেক মহাজীবন বা মহাপুরুষের বাণীর সঙ্গে মিলে যায়। অন্যদিকে মানবজীবনের অন্তঃসত্তার এই প্রকাশটি সার্বজনীন। সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই যে উপন্যাসটি রচিত তা বলা উচিত নয় সঠিক প্রমাণ না থাকলে। ফলে এরকমভাবে অনেক উপন্যাস সূচিত করা যায়নি ও আমাদের আলোচনায় আসতে পারেনি। কিন্তু যে কটি উপন্যাস এসেছে তাতে সমকালীন সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, এমনকী, ভবিষ্যতেও যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব থেকে যাবে অস্থির মানসিকতার মধ্যবিত্ত ভাবনায়—তা বলা যায়।

একই সঙ্গে দেখা যায়, এই মানসিকতার দরুণ কথাসাহিত্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকী, অনেক ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের বিভিন্ন আদলে তিনি এসেছেন। সেদিক থেকে কথাসাহিত্যের ধরনে যেমন নতুনত্ব এসেছে, তেমনি জীবনী উপন্যাস রচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। অন্যদিকে উপন্যাস একটি বিপরীতধর্মী ভক্তসুলভ মানসিকতায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেকখানি বাস্তবোচিত করে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠেছে।

সূত্র নির্দেশ

১. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ‘কামিনী ও কাঞ্চন’, প্রকাশক কেশবচন্দ্র রক্ষিত, মজিলপুর, ২৪ পরগণা, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩১৫, শিরোনাম পত্র

২. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ‘কামিনী ও কাঞ্চন’, প্রকাশক কেশবচন্দ্র রক্ষিত, মজিলপুর, ২৪ পরগণা, চতুর্থ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৩২, শিরোনাম পত্র

৩. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ‘কামিনী ও কাঞ্চন’, প্রকাশক কেশবচন্দ্র রক্ষিত, মজিলপুর, ২৪ পরগণা, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩১৫, ভূমিকা অংশ

৪. ঐ, ভূমিকা অংশ

৫. ঐ, ভূমিকা অংশ

৬. ঐ, পৃ. ৩

৭. ঐ, পৃ. ২২

৮. ঐ, পৃ. ৭৪

৯. ঐ, পৃ. ৯২

১০. ঐ, পৃ. ১১০

১১. ঐ, পৃ. ১১৯

১২. ঐ, পৃ. ১৪৬

১৩. ঐ, পৃ. ১৫৬

১৪. ঐ, পৃ. ২১৯

১৫. ঐ, পৃ. ২৬২

১৬. ঐ, পৃ. ২৮০

১৭. ঐ, পৃ. ২৯২

১৮. ঐ, পৃ. ২৯৯

১৯. ঐ, পৃ. ২৯৯

২০. ঐ, পৃ. ৩১২

২১. ঐ, পৃ. ৩৩১

২২. ঐ, পৃ. ৩৪৬

২৩. ঐ, পৃ. ৩৪৬

২৪. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, 'ভক্তের ভগবান্', প্রকাশক শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রক্ষিত, মজিলপুর, ২৪ পরগণা, দ্বিতীয় সংস্করণ-সংশোধিত, আষাঢ় ১৩২২, ভূমিকা অংশ

২৫. ঐ, পৃ. ৩

২৬. ঐ, পৃ. ১৩

২৭. ঐ, পৃ. ৩২

২৮. ঐ, পৃ. ৩৮

২৯. ঐ, পৃ. ৩৮

৩০. ঐ, পৃ. ৬৬

৩১. ঐ, পৃ. ৬৩

৩২. ঐ, পৃ. ৭৫

৩৩. ঐ, পৃ. ৭৫

৩৪. ঐ, পৃ. ৭৭

৩৫. ঐ, পৃ. ৮০-৮১

৩৬. ঐ, ভূমিকা অংশ

৩৭. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, অখণ্ড সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮৫, পৃ. ৩৭

৩৮. ঐ, পৃ. ৩১৯

৩৯. ঐ, পৃ. ৪৩৭

৪০. ঐ, পৃ. ২৮৬

৪১. ঐ, পৃ. ২৩৯-২৪০

৪২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ‘কবি শ্রীরামকৃষ্ণ’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৭, ভূমিকা অংশ

৪৩. ঐ, পৃ. ১৩৩

৪৪. ঐ, পৃ. ১৮

৪৫. ঐ, পৃ. ১৯

৪৬. ঐ, পৃ. ১৯

৪৭. অজাতশত্রু, ‘গদাধর’ (১ম খণ্ড), কল্পতরু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা ১৩৬৫, ‘লেখকের কথা’ অংশ

৪৮. ঐ

৪৯. ঐ, পৃ. ১০

৫০. ঐ, পৃ. ২৬৪

৫১. ঐ, পৃ. ২৭০

৫২. ঐ, পৃ. ৩২৬

৫৩. শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত, ‘মুক্তপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ’, অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৫ আগষ্ট ১৯৫৬, পৃ. ১

৫৪. ঐ, পৃ. ২০৪-২০৫

৫৫. ঐ, পৃ. ১০০

৫৬. ঐ, পৃ. ৫৭

৫৭. ঐ, পৃ. ১৩৩

৫৮. শ্রীচিত্রগুপ্ত, 'মুক্তপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', সিটি বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ১৩৬৪, পৃ. ৪৪-৪৫

৫৯. ঐ, পৃ. ১১১

৬০. ঐ, পৃ. ১১১-১১২

৬১. মণি গঙ্গোপাধ্যায়, 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ', গ্রন্থম্, কলকাতা, মে ১৯৬০, সূচনা অংশ

৬২. ঐ, পৃ. ৩

৬৩. ঐ, পৃ. ৩-৪

৬৪. ঐ, পৃ. ৪১

৬৫. নন্দলাল ভট্টাচার্য, 'শতাব্দীর কল্পতরু', লিপিকা, কলকাতা, ১৩৬৭, 'ক'টি কথা' অংশ

৬৬. ঐ, পৃ. ৯

৬৭. ঐ, পৃ. ১৬-১৭

৬৮. অজ্ঞাত, 'জনক-জননী', পৃ. ২৪

৬৯. ঐ, 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশ

৭০. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'রত্নাকর শ্রীরামকৃষ্ণ', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২০, ভূমিকা অংশ

৭১. ঐ, পৃ. ২৮

৭২. ঐ, পৃ. ২৯২

৭৩. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য গিরিশচন্দ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৮৩

৭৪. ঐ, পৃ. ৯৩

৭৫. ঐ, পৃ. ১৫২

৭৬. ঐ, পৃ. ১৬১

৭৭. ঐ, পৃ. ১৮৪

৭৮. ঐ, পৃ. ১৯১

৭৯. ঐ, পৃ. ১৯১-১৯২

৮০. ঐ, পৃ. ১৯২

৮১. ঐ, পৃ. ২১৭

৮২. ঐ, পৃ. ২১৭

৮৩. ঐ, পৃ. ২২৭

৮৪. ঐ, পৃ. ২৪০

৮৫. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'অশেষ', সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০০৬, পৃ. ৭

৮৬. ঐ, পৃ. ১৫

৮৭. ঐ, পৃ. ৫০

৮৮. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৬

৮৯. ঐ, পৃ. ১২৮

৯০. ঐ, পৃ. ১৪৫

৯১. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'ধর্মযুদ্ধ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২৭

৯২. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, 'গঙ্গাবক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ', লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ১৯-২০

৯৩. ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : শেষ অমৃত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্তিত সংস্করণ, জুন ২০০০, 'লেখকের কথা' অংশ

৯৪. ঐ, পৃ. ১০৮

৯৫. নটরাজন, 'শেষ ২৪৮ দিন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, 'নিবেদন' অংশ

৯৬. ঐ

৯৭. ঐ, পৃ. ১৪১

৯৮. ঐ, পৃ. ১৪৬

৯৯. ঐ, পৃ. ১৪৬

১০০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, মুদ্রণ- পৌষ ১৪১৭, পৃ. ৭৭১

১০১. 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৮, রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাস (প্রবন্ধ), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (প্রাবন্ধিক), পৃ. ১৩৮

১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, সুলভ সংস্করণ, মুদ্রণ- পৌষ ১৪১৭, পৃ. ৯৮৪

১০৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত, 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র' (অখণ্ড সংস্করণ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ. ৩৯৪

১০৪. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৪২-১৪৫

১০৫. সুকুমার সেন সম্পাদিত, 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র' (অখণ্ড সংস্করণ), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ. ৫৯১

১০৬. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'চারু গ্রন্থাবলী', বসুমতী-সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৬

১০৭. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৩৩

১০৮. শংকর, 'মনজঙ্গল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ১৭৭

১০৯. শংকর, 'মনজঙ্গল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫, পৃ. ৪৭

১১০. বিমল মিত্র, 'সাহেব বিবি গোলাম', নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৭, পৃ. ১৫২-১৫৩

১১১. বিমল মিত্র, 'সাহেব বিবি গোলাম', নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৭, পৃ. ২১২

১১২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ‘প্রথম আলো’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১০, ‘লেখকের কথা’ অংশ

১১৩. আশাপূর্ণা দেবী, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১৩৭১/১৪১০, পৃ. ৩৩২

১১৪. মৈত্রেয়ী দেবী, ‘ন হন্যতে’, প্রাইমা পাবলিকেশন, ৭ম মুদ্রণ, ১৯৮৩, পৃ. ২৩০

১১৫. শংকর, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত’, সাহিত্যম, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, জুন ২০১৪, ভূমিকা অংশ

১১৬. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘একা’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০৪, পৃ. ৯

১১৭. ঐ, পৃ. ১০৮

১১৮. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘দীনজনে (১ম)’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ. ৮২

১১৯. ঐ, পৃ. ৪৬

১২০. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘দীনজনে (২য়)’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৬, পৃ. ১৩৮-১৩৯

১২১. সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ‘লোটাকম্বল’, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ২০০৯, পৃ. ৮৪৯

১২২. সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ‘আত্মারামের কৌটো’, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৪২০, পৃ. ২৬